শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা (হক দীন)

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আশ-শাইখ আবদুর রহমান ইবন হাম্মাদ আ-লে উমার

অনুবাদ : আ ছ ম তরিকুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

الشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر

ترجمة: أ.ص.م طريق الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলবর্গের (আলাইহিমুছ ছালাম) প্রতি দরূদ ও সালাম। আমি নর হোক অথবা নারী হোক, প্রত্যেক জ্ঞানীর জন্যে মুক্তির এ আহ্বানকে উপস্থাপন করছি। আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে, পথভ্রষ্টরা এথেকে কল্যাণ লাভ করবে। আমি ও যারা এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন সকলের জন্যে উত্তম সওয়াবের জন্য দো'আ করছি।

এরপর আমি সাহায্যকারী আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলতে চাই:-

হে জ্ঞানবান, আপনার যে রব আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে জানা ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে কোনো মুক্তি ও মঙ্গল নেই। তাঁর উপর ঈমান আনা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, আপনার রব কর্তৃক আপনার কাছে ও সকল মানুষের কাছে প্রেরিত নবীকে জানা, তাঁর উপর ঈমান আনা, তাকে অনুসরণ করা, আপনার যে দীন গ্রহণ করতে আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সত্য দীনকে জানা, এর প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত আপনার কোনো মুক্তি ও কল্যাণ নেই।

আর এ গ্রন্থ, 'দীনে হক্ক' বা 'শাশ্বত জীবনব্যবস্থা', যা আপনার সামনে পেশ করছি, তাতে এসব মহান বিষয়সমূহের বর্ণনা রয়েছে। যা জানা ও আমল করা আপনার উপর একান্ত কর্তব্য। কোনো কোনো বাক্য বা কোনো কোনো মাসআলাতে যদি অতিরিক্ত বর্ণনার

প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সেটাকে আমি গ্রন্থটিকায় আলোচনা করেছি। তা সবই বর্ণনা করেছি মহান আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর ভিত্তি করেই। কারণ হক দীন, যা ব্যতীত আল্লাহর আর কিছু গ্রহণ করবেন না, তার একমাত্র প্রত্যাবর্তনস্থল তো এ দু'টি বস্তুই।

আর আমি অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে দিয়েছি, যা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। বরং আমি এ গ্রন্থে এমন কিছু সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছি যারা পথভ্রষ্ট অথচ তারা হকের উপর আছে বলে দাবী করে, বাস্তবে তারা হক দীন থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। যাতে করে এসব দল ও মতের দিকে সম্পর্কযুক্ত অজ্ঞ মানুষ ও অন্যান্যরা তা থেকে সাবধান হতে পারে। আর আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।

প্রথম অধ্যায়

মহান স্রষ্টা আল্লাহ[১] সম্পর্কে জ্ঞান,

হে জ্ঞানবান, জেনে রাখুন, নিশ্চয় যিনি আপনাকে নাস্তি (অস্তিত্বহীন) থেকে তৈরী করেছেন, সেই আল্লাহই বিশ্বজগতের রব্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার[২] প্রতি ঈমান গ্রহণকারী জ্ঞানীরা তাঁকে চোখে না দেখলেও, এমন বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, তিনি বিদ্যমান, তিনি স্রষ্টা, তিনি সকল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী, যার মাধ্যমে তারা তাঁকে জেনেছেন। এ সকল প্রমাণাদি হচ্ছে:

১. জগত, মানুষ ও জীবন: এগুলো সবই নশ্বর। যার প্রথম ও শেষ রয়েছে। যা অন্যের মুখাপেক্ষী। নশ্বর ও অন্যের মুখাপেক্ষী সবই সৃষ্ট, আর প্রত্যেক সৃষ্টের জন্যই স্রষ্টা অত্যাবশ্যক, এ মহান স্রষ্টাই হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ স্বয়ং নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি স্রষ্টা, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে এটি আলোচিত হয়েছে।

---

[1] (আল্লাহ) সমগ্র জগত, মানুষ ও সবকিছুর ইলাহ এর নাম। এটি হচ্ছে তাঁর সত্তার নাম। পবিত্র সত্তাকে তিনি এ নামে নামকরণ করেছেন। তিনি (الإله الحق) সত্যিকারের ইলাহ।

[2] (تعالى) সম্মানসূচক ও আল্লাহর গুণগান সম্বলিত শব্দ যা তাঁর সর্বোচ্চতা ও পবিত্রতাকে নির্দেশ করে (سبحانه) অর্থা□ আল্লাহ পবিত্র।

আল্লাহর রাসূলগণ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাক্যকে মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٤]

"নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের রব্ব, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন, যা দ্রুতগতিতে এর পিছে অনুসরণ করে। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি তাঁর নির্দেশ পালনে নিয়োজিত। অবশ্যই সৃষ্টি ও নির্দেশের অধিকার তাঁরই। সুতরাং সমগ্র বিশ্ব জগতের রব্ব আল্লাহই অতীব বরকতময়।" (আল-আরাফ: ৪৫)

আয়াতটির সারমর্ম:

আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনিই তাদের রব্ব যিনি সমগ্র আসমান যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।[৩]

---

[3] সময়ের ক্রমানুসারে আল্লাহর ইচ্ছাকৃত এ সৃষ্টি তার হিকমাতেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় তিনি চোখের পলকের চেয়েও কম সময়ে সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনিই তো বলেছেন "যখন তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, বলেন 'হয়ে যাও', আর তা হয়ে যায়।"

তিনি এটিও জানাচ্ছেন যে, তিনি আরশের উপর উঠেছেন।[4] আরশ হচ্ছে আসমানসমূহের উপরে, যা সৃষ্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রশস্ত।

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থেকে সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এগুলোর কোনো বিষয় তাঁর অগোচরে থাকে না। তিনি এটিও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে সৃষ্টি করেছেন যা দিনকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং দ্রুতগতিতে তা দিনকে অনুসরণ করে। তিনি সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্ররাজী সবকিছুকে বিন্যাস করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই নির্দেশে তারা তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। তিনি আরো বলেছেন- সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেয়ার অধিকার একক তার জন্যই সংরক্ষিত। তিনি সদা-সর্বদা অনেক কল্যাণ দান করে থাকেন, তিনিই বিশ্বজগতের

---

[4] আরবদের ভাষা তথা কুরআনের ভাষায় কোনো কিছুর উপরে উপরে উঠাকে (استوى على شيء) বলা হয়। তাই (استوى على عرشه) এর অর্থ, তিনি আরশের উপরে উঠেছেন, যা তার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার জন্য মানানসই। তবে সে উপরে উঠার স্বরূপ কী তা তা কেউ জানে না। (استوى) এর অর্থ কখনও (استولى) নয়। অর্থা আধিপত্য বিস্তার করা নয়, যেমন ভ্রষ্টলোকেরা ধারণা করে থাকে, যারা আল্লাহ যে সমস্ত গুণে নিজেকে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন, সে সমস্ত গুণাবলীর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তারা এটা এ ভেবে করে যে, যদি ঐ সমস্ত গুণে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হয় তাহলে কোনো সৃষ্টির সমতুল্য বলে তিনি গণ্য হবেন। বস্তুত এটি ভিত্তিহীন মতবাদ। কেননা সৃষ্ট তুল্য অর্থ হচ্ছে এ বলা যে, তাঁর এ গুণাবলী সৃষ্টের এ গুণাবলীর সমতুল্য তাঁর এ গুণাবলী তাদের এ গুণের মত। কিন্তু কাল্পনিক তুলনা, উপমা, কেমনত্ব দ্বারা আমরা আল্লাহর গুণাগুণ তথা বিশেষণকে বুঝতে অক্ষম। এসব কিছুকে গ্রহণ করে তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য যে কোনো গুণে তাঁকে গুণান্বিত করাই হচ্ছে রাসূলগণের পদ্ধতি। এটাকেই আমাদের সালাফে ছালেহীন অনুসরণ করেছেন। এটাই সত্য, যেটাকে মুমিনদের আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব, যদিও অনেকেই এটাকে পরিত্যাগ করেছে।

রব্ব যিনি তাদেরকে নাস্তি থেকে তৈরী করেছেন। তাদেরকে নিয়ামত দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧ ﴾ [فصلت: ٣٧]

"আর তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে রাত্র, দিন, সূর্য ও চন্দ্র অন্যতম। সূর্যকে তোমরা সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। ঐ আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো তৈরী করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তার ইবাদত করতে চাও"। (হামীম সিজদা: ৩৭)

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে,

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, রাত্র-দিন, সূর্য-চন্দ্র তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম। সাথে সাথে সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদাও করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা এ দুটিও অন্যান্য জিনিসের মত সৃষ্টের অন্তর্ভুক্ত, আর সৃষ্টকে ইবাদত করা একেবারেই অবৈধ। আর এ সিজদাও ইবাদতের অংশ বিশেষ এবং অন্যান্য আয়াতের মত এখানেও তিনি একক আল্লাহকে সিজদার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তিনিই স্রষ্টা, তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী এবং একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য সত্তা।

২. নর-নারীর সৃষ্টি: আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদেরকে যে অকাট্য প্রমাণসমূহের পথ নির্দেশনা দিচ্ছে,

তন্মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের সৃষ্টি অন্যতম। এ দু'য়ের বিদ্যমানতা আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩. ভাষা ও রং-এর ভিন্নতা: কখনও দু'জন একই কণ্ঠের ও একই রং-এর পাওয়া না বরং এদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

৪. তাকদীরের পার্থক্য: একই সময় অনেকেই জ্ঞানী চিন্তাশীল বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও ধন মর্যাদা ও সুন্দরী স্ত্রী লাভ করতে আগ্রহী। কেউ ধনী, দরিদ্র, কেউ শাসক, কেউ শাসিত হয়েই থাকতে হয়। কেননা, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত সে অন্যকিছু অর্জন করবে না। এর মধ্যে আল্লাহ চান এমন ধরনের গুঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে; সেটি হচ্ছে. মানুষদের একের দ্বারা অপরকে তিনি পরীক্ষা করতে চান এবং সকলের প্রয়োজন পূরণ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য একের দ্বারা অপরের খেদমত করাতে চান। এ পৃথিবীতে আল্লাহ যার তাকদীর ভাল নির্ধারণ করেন নি তার জন্য জান্নাতে অতি উত্তম নিয়ামত সংরক্ষণ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন; যদি সে আল্লাহর উপর ঈমান নিয়ে মারা গিয়ে থাকে। এর পরেও আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রদের মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা অনেক ধনীজন পায় নি। এটি আল্লাহর হিকমত ও ন্যায় বিচারের নিদর্শন।

৫. নিদ্রা ও সত্য স্বপ্ন : যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অনেক অজানা বিষয়ের সুসংবাদ দান বা ভীতি প্রদর্শণ করে থাকেন। তিনি বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [الروم: ٢٣]

“দিন ও রাত্রে তোমাদের স্বপ্ন তারই নিদর্শন।” (আর-রূম: ২৩)

৬. রূহ: যার বাস্তবতা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

৭. মনুষ্য শরীর: মানুষ এবং তার শরীরের ইন্দ্রিয়, শিরা ও উপশিরা ও মস্তিষ্কের সরঞ্জাম ও পরিপাকের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি।

৮.বৃষ্টি: আল্লাহ মৃত পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন রং এর, বিভিন্ন প্রয়োজনের বিভিন্ন তৃণ ও বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণাদির মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রমাণ। যে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং যে সম্পর্কে এ মর্মে বিবৃতি দিয়েছেন যে, এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার অস্তিত্ব ও তিনি যে স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টের নিয়ন্ত্রণকারী তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

৯. মনুষ্য প্রকৃতি: যে প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে সে তার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। যে এটাকে অস্বীকার করে সে তার আত্মাকে ভ্রান্তি ও হতাশায় নিক্ষেপ করে। উদাহরণস্বরূপ কম্যুনিষ্টের কথা উল্লেখ করা যায়। সে[5] এ

---

[5] যদি সে তওবা করে ফিরে আসে, আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের উপর ঈমান আনার মত ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাহলে আল্লাহও তাওবাকারীদের দিকে ফিরে আসেন।

জীবনে ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে বাস করে এবং যিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে তাকে তৈরী করলেন ও নিয়ামতের দ্বারা বড় করলেন তাকে মিথ্যা বলার কারণে মৃত্যুর পরে তার গন্তব্যস্থান হবে জাহান্নাম। যদি না সে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তার উপর, তার দীনের উপর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে।

১০. আল্লাহর কোনো কোনো সৃষ্টিতে বরকত ও প্রাচুর্যের সমাহার ঘটা: যেমন ছাগল; আর বরকতের বিপরীত হচ্ছে অকর্মণ্য ও নিষ্ফল হওয়া যেমন কুকুর ও বিড়ালে।

আল্লাহর গুণের ভিতরে এটিও যে, তিনি প্রথম, যার কোনো শুরু নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, মৃত্যুবরণ করবেন না এবং কখনও শেষ হবেন না। তিনি ধনাঢ্য, নিজেই প্রতিষ্ঠিত, অন্যের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾ [الاخلاص: ١، ٤]

"অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। তুমি বল, তিনিই আল্লাহ, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো জন্ম দেননি, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ তাঁর সমতুল্যও নেই" (সূরা ইখলাস: ১-৪)

আয়াতের মর্মার্থ:

যখন কাফেররা শেষ নবীর কাছে আল্লাহর গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করল তখন আল্লাহ এ সূরা অবতীর্ণ করেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাদের উদ্দেশ্যে এ বলার নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র বিশ্বজগত, মানুষ জাতি ও সব কিছুর উপরে তাঁরই একক কর্তৃত্ব রয়েছে। সকল প্রয়োজন মিটানোর জন্য মানুষদের শুধুমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া ওয়াজিব। তিনি জন্ম দেন নি, জন্মও নেন নি। তাঁর কোনো পুত্র বা কন্যা, পিতা অথবা মাতা হতেই পারে না। তাঁর ক্ষেত্রে এগুলো যে হতেই পারে না, অন্য সূরাগুলোতেও তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা, পর্যায়ক্রমে আসা ও জন্মলাভ সৃষ্টির গুণ বিশেষ। এর দ্বারা তিনি খৃষ্টানদের কথা- ঈসা আল্লাহর পুত্র' ও ইয়াহূদীদের কথা 'উযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং অন্যান্যদের কথা 'ফিরিশতারা আল্লাহর কন্যা' কে রহিত করেছেন। তাদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদের কথা বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নিজ কুদরতে আল্লাহ মাসীহ ঈসা আলাইহিস সালামকে মাটি হতে ও মানব মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামকে আদমের পাঁজর হতে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম হাওয়া আলাইহাস সালামকে তার পার্শ্বে দেখলেন। এরপর আদম সন্তানদেরকে নর-নারীর বীর্য হতে তৈরী করলেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সব কিছুকে অবিদ্যমানতা হতে এবং এরপর সকল সৃষ্টিকে বিশেষ নিয়ম

ও পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। যখন তিনি এ নিয়ম পদ্ধতিকে যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করতে চান, করেন। যেমন তিনিই ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়া মাতা হতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে দোলনায় কথা বলানো, মূসা আলাইহিস সালামের লাঠিকে ধাবমান সাপ বানানো, তদ্বারা সমুদ্রের উপরে আঘাত করে তন্মধ্যে তিনি ও তাঁর কওমের অতিক্রমযোগ্য রাস্তা বানানো, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, অতিক্রমের সময় গাছ কর্তৃক তাঁকে সালাম জানানো। প্রাণীর পক্ষ থেকে তার বিশ্বস্ততার এমন সাক্ষ্য প্রদান যা মানুষেরা শুনেছে, এর কথা ছিল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ঠিক তেমনিভাবে তাঁকে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত বোরাকে করে রাত্র ভ্রমণ করানো হয়। তাঁর সাথী ছিলেন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম। যখন আসমানের উপরে পৌছলেন, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বললেন। তাঁর উপর ছালাত ফরয করার পর তিনি তিনি মসজিদে হারামে ফিরে আসেন এবং আসমানের প্রত্যেক অধিবাসীগণ চলার পথে তাঁকে দেখেছেন। এটা ছিল এক রাত্রিতে সূর্য উঠার পূর্বে। রাত্র ভ্রমণ ও মিরাজের ঘটনা কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

আল্লাহর অন্যান্য গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ইচ্ছাশক্তি। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। কোনো পর্দা তাঁর শোনা ও দেখার প্রতিবন্ধক হতে পারে না। মাতৃগর্ভে কি রয়েছে

এবং মানুষের অন্তরে কি লুকায়িত, যা হয়েছে ও যা হবে, সব কিছুই তিনি জানেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা পোষণকারী, যখন যা ইচ্ছা করেন বলেন, “হয়ে যাও” অতঃপর তা হয়ে যায়।

তাঁর পবিত্র সত্তা নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিনি যখন চান, যার সাথে চান, তার সাথে কথাবার্তা বলেন। তিনি মূসা আলাহিস সালাম ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআনের অক্ষরসমূহ ও অর্থসমূহ আল্লাহরই বাণী। তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তিনি এটি অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর ‘বাণী’ (কুরআন)ও তাঁর গুণাবলীর মধ্য থেকে একটি গুণ; এটি সৃষ্ট কিছু নয় যেমনটি পথভ্রষ্ট মু‘তাযিলারা বলে থাকে।

তিনি নিজকে নিজে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, চেহারা, হাত, উর্ধ্বাবস্থান, অবতীর্ণ হওয়া[৬] খুশি হওয়া, রাগ করা। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি খুশী হন এবং কাফির ও তাঁর অপছন্দ কার্যাদিতে নিমজ্জিতদের প্রতি রাগান্বিত হন। তাঁর খুশী হওয়া, রাগ করা, চেহারা ও হাত থাকা, উর্ধ্বাবস্থান নেয়া, অবতীর্ণ হওয়া তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর মত তার শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল গুণাবলী, যা

---

[6] ঐ হাদীসের আলোকে যেখানে বলা হয়েছে, “আমাদের রব্ব শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন”।

কোনো সৃষ্টের গুণের সাথে তুলনা হয় না। কোনো অপব্যাখ্যা ও ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই সাব্যস্ত করতে হবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীছে এটি প্রমাণিত যে, মুমিন বান্দাগণ কেয়ামতের মাঠে ও জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে দেখবেন।

আল্লাহর গুণাবলী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। আপনি সেগুলো বিস্তারিতভাবে দেখে নিন।

আল্লাহ্ কর্তৃক মানব সন্তান, জিন জাতি ও অন্যান্যদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জানলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনার রব্ব, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে নিশ্চয় তিনি আপনাকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নি। বরং আপনাকে তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর উক্তিই এর প্রমাণ,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨ ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٨]

"আমি আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য চাই না এবং আমাকে তারা খাওয়াক, এটাও চাইনা। নিশ্চয় তিনিই আল্লাহ, যিনি খাদ্যদাতা, সুদৃঢ় শক্তির অধিকারী"। (আয-যারিয়াত- ৫৬-৫৮)

আয়াতগুলোর সারমর্ম:

প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন- তিনি জ্বিন[7] জাতি ও আদম সন্তানদেরকে শুধুমাত্র তাঁকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে

---

[7] জিন: তারা হচ্ছে আল্লাহর এক বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি। যাদেরকে আল্লাহ তাদের ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তারা আদম সন্তানের মতই যমীনে বাস করে। কিন্তু আদম সন্তানরা তাদের দেখতে পায় না।

অমুখাপেক্ষী। আর তিনি তাদের থেকে রিযকও চান না, খানাও চান না; কেননা তিনিই রিযিকদাতা, শক্তিশালী। মানুষ বা অন্য কিছুকে একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকেই রিযিক দেওয়া হয়। তিনি ঐ সত্তা যিনি বৃষ্টি দান করেন এবং মাটির মধ্য হতে রিযিক বের করেন।

অপর দিকে পৃথিবীর জ্ঞানহীন অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কে বলা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলোকে মানুষের জন্য তৈরী করেছেন, যাতে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষরা এদের সহযোগিতা নিতে পারে এবং ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্ট ও প্রতিটি নড়াচড়া ও নিস্তব্ধতাকে আল্লাহ তা'আলা এক তাৎপর্যপূর্ণ করে তৈরী করেছেন, যা তিনি কুরআনে বর্ণনা করেছেন ও জ্ঞানের মান অনুযায়ী আল্লাহর শরী'আতের আলিমগণ এটা উপলব্ধিও করেন। এমনকি বয়সের ভিন্নতা, রিযিক, বিপদ আপদের পার্থক্য, তাও আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে; যাতে জ্ঞানী বান্দাদের পরীক্ষা করা যায়। অতঃপর আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপরে যিনি খুশী থাকেন ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন সে কাজ করার জন্য কষ্ট করেন, তার উপরে আল্লাহও খুশী হন এবং তিনি দুনিয়াতে ও মৃত্যুর পরে আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হন। আর যে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপরে খুশী থাকে না, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে না, তার আনুগত্য দেখায় না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন। দুনিয়া আখিরাতে সে ভাগ্যহত, সে হতভাগ্য বিড়ম্বনা-পতিত দূর্ভাগা। এধরনের অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে আমরা

আল্লাহর সন্তুষ্টি চাচ্ছি। তাঁর কাছে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হিসাব কিতাব কাজের প্রতিদান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জানলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তাঁর ইবাদাত করার জন্য তৈরী করেছেন। এরপর জানুন যে, তিনি তাঁর রাসূলদের উপরে অবর্তীর্ণ সকল গ্রন্থে, তিনি যে মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থান করবেন ও প্রতিফলের নিবাসস্থলে আপনার কর্মের প্রতিফল দিবেন তা বলে দিয়েছেন। কেননা মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে এ কর্মময় নশ্বর জগতের জীবন হতে মৃত্যুর পরে ফলাফলের ও চিরস্থায়ী জগতে প্রস্থান করে। অতএব, যখন আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য নির্ধারিত আয়ূষ্কাল পূর্ণ হয়ে যায়, আল্লাহ মৃত্যুর ফিরিশতাকে তার শরীর হতে রূহকে কব্জ করার নির্দেশ দেন। সে শরীর হতে রূহ বের হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করার পরে মৃত্যু বরণ করে।

তখন তার রূহ যদি পূর্বেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকে, তাঁর আনুগত্য দেখিয়ে থাকে, তবে তাকে আল্লাহ নিয়ামতের গৃহে রেখে দেবেন। পক্ষান্তরে তার রূহ যদি আল্লাহকে অস্বীকারকারী হয়, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও প্রতিফল লাভকে মিথ্যা বলে থাকে, তবে তাকে আল্লাহ শাস্তি গৃহে ঐ সময় পর্যন্ত রেখে দিবেন যতক্ষণ না দুনিয়ার নির্ধারিত দিন সমাপ্ত হয়ে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এবং একক আল্লাহ ছাড়া সকল অবশিষ্ট সৃষ্ট মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ সকল সৃষ্টকে এমনকি পশুকেও পুনরুত্থান করবেন। প্রথমে যেমনভাবে তাঁর

সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি শারীরিক পূর্ণতা দান করে তাদের শরীরে তিনি তাদের রূহ ফিরিয়ে দিবেন; এজন্য যে পুরুষ-মহিলা, শাসক-শাসিত, ধনী-দরিদ্র সকলেই কৃতকর্মের ফলাফল দান ও হিসাব-কিতাব করা যায়। সুতরাং তিনি কারো প্রতি যুলুম করবেন না। কেননা অত্যাচারিত সেদিন অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ নিবে। এমনকি প্রাণীরাও যারা তার উপর অত্যাচার করেছিল পরস্পর একে অন্য থেকে প্রতিশোধ নিবে। তিনি এদেরকে নির্দেশ দিবেন "মাটি হয়ে যাও" কেননা এরা জান্নাত বা জাহান্নাম কোথাও প্রবেশ করবে না। আর সে দিন মানব সন্তান ও জ্বিন প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁর আনুগত্য করেছিলেন, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছিলেন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদিও তিনি দুনিয়ার সব চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি হয়ে থাকেন, অন্যদিকে কাফির মিথ্যাবাদীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, যদিও তারা পৃথিবীতে সর্বাধিক ধনী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾ [الحجرات: ١٣]

"নিশ্চয় যে সবচেয়ে তাকওয়াসম্পন্ন, সেই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাবান"। (হুজরাত-১৩)

জান্নাত:

জান্নাত নিয়ামতের স্থান। এখানে বিভিন্ন প্রকারের এমন নিয়ামত বিদ্যমান যা কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। এখানে একশত স্তর রয়েছে। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও তাদের আনুগত্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের অধিকারী সেখানে অবস্থান করবেন। জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসীকে ঐ নিয়ামত দেওয়া হবে যা দুনিয়ার সবচেয়ে নিয়ামত উপভোগকারী বাদশাহর নিয়ামতের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি।

জাহান্নাম:

আমরা এ জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এটি মৃত্যুর পরে আখেরাতে শাস্তির স্থল। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, যার স্মরণ অন্তরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে, চক্ষুকে কাঁদায়। যদি আখিরাতে মৃত্যুবরণের সুযোগ থাকত তাহলে শুধু এর অবস্থা দেখেই জাহান্নামবাসীরা মৃত্যুবরণ করত। পক্ষান্তরে মৃত্যু মাত্র একবারই হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষগণ ইহলৌকিক জীবন থেকে পারলৌকিক জীবনে প্রস্থান করে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে পূর্ণাঙ্গ আকারে মৃত্যু, পুনরুত্থান, হিসাব, পুরস্কার, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আমরা এখানে যা যা উল্লেখ করলাম, তা ঐগুলোর ইঙ্গিত মাত্র।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাবকাল, প্রতিফল লাভ সম্পর্কে অসংখ্য দলীল রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ ۞مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾ ﴾ [طه: ٥٥]

"এ (মাটি) থেকেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এর মধ্যেই আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব। এর থেকেই তোমাদেরকে আমরা পুনরায় বের করব"। (ত্বহাঃ ৫৫)

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]

"আর সে আমাদের জন্য উপমা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম বৃত্তান্ত ভুলে গেছে। সে বলে, পচাগলা হাঁড়কে কে জীবিত করবে? বলে দিন, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি সেগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী" (ইয়াসীন- ৭৮-৭৯)

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ ﴾ [التغابن: ٧]

"কাফিররা ধারণা করেছে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, অবশ্যই তোমার রব্বের শপথ, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত

করা হবে এবং এটি আল্লাহর পক্ষে একেবারেই সহজ"। (আত্ তাগাবুন-৭)

আয়াতসমূহের সারমর্ম:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা প্রথম আয়াতটিতে বলেছেন, নিশ্চয় তিনি মানব সন্তানদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এটা ঐ সময়ের কথা, যখন তিনি তাদের পিতা আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আরও বলেন: তিনি অবশ্যই তাদেরকে মৃত্যুর পরে কবরের মাটিতে ফিরিয়ে আনবেন; যাতে তাদের সম্মান রক্ষা হয়। আরও জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয়বার তিনি তাদেরকে মাটি থেকে বের করবেন। এরপর প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আল্লাহ জীবিত বের করবেন এবং তাদের হিসাব কিতাব করবেন, অতঃপর তাদের পুরস্কার দিবেন।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে পুনরুত্থানে মিথ্যারোপকারী কাফির, যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া হাঁড় জীবিত করাকে আশ্চর্য মনে করে, আল্লাহ তার প্রতিউত্তর দিয়েছে। তিনি বলেন, যে, তিনি এ হাঁড়কে জীবিত করতে সক্ষম। কেননা তিনি একে নাস্তি হতে অস্তিত্বে প্রথমবার নিয়ে এসেছিলেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে মিথ্যারোপকারী কাফিরদের ধারণাকে বাতিল প্রতিপন্ন করেছেন ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর শপথ করে জোরালো

ভাষায় বলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় অতি নিকট সময়ে আল্লাহ তাদেরকে উত্থান করবেন এবং তাদের সকল কৃতকর্ম যা তারা করেছেন জানিয়ে দিবেন, এর উপরে প্রতিফল দান করবেন এবং এ কাজ আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় তিনি যখন পুনরুত্থান ও জাহান্নামে মিথ্যারোপকারীদেরকে পুনরুত্থান ঘটাবেন তখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে সাজা দিবেন। তাদেরকে বলা হবে,

﴿ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝٢٠﴾ [السجدة: ٢٠]

“ঐ জাহান্নামের শাস্তি উপভোগ কর, যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে”। (সিজদাহ-২০)

মানুষের কৃতকর্ম ও কথাবার্তায় সংযম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানাচ্ছেন, নিশ্চয় মানুষগণ যা করে ও করবে ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য হোক সব কিছুই আল্লাহ জানেন। এগুলো তিনি তার নিকট লাওহে মাহফুজে আসমান যমীন ও মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এরপর তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দু’জন ফেরেশতা, একজন ডানে ভালো কৃতকর্ম লেখার জন্য, আর অপরজন বামে খারাপ কৃতকর্ম লেখার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তাদের থেকে কোনো কিছু বাদ পড়ে না। আল্লাহ আরো বলেছেন, নিশ্চয় হিসাবের দিনে প্রত্যেককে

তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, যাতে তারা যা বলেছে ও করেছে লেখা হয়েছে। তারা তা পড়বে এবং এ থেকে কোনো কিছুকে অস্বীকার করবে না। যদি কেউ কিছু অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ তার কান, চোখ, দু'হাত ও চামড়া যা যা করেছে, সেগুলোকে কথা বলাবেন।

বিস্তারিতভাবে মহাগ্রন্থ কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ ﴾ [ق: ١٨]

"যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয় সেটা সংরক্ষণের জন্যই সেখানে চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক (ফিরিশতা) তার কাছে বিদ্যমান থাকে"। (ক্বাফ-১৮)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢ ﴾ [الانفطار: ١٠، ١٢]

"এবং নিশ্চয় তোমাদের উপরে তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মানিত আমল লিখকবৃন্দ নিযুক্ত রয়েছেন। তোমরা যা কর তা তারা জানেন"। (ইনফিতার- ১০-১২)

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দুইজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তার ডান পার্শ্বে থাকেন 'রকীব' বা পর্যবেক্ষক, যিনি তার সমগ্র পূণ্যের কাজ লিপিবদ্ধ করেন। বাম পার্শ্বে থাকেন 'আতীদ', বা 'অতন্দ্র প্রহরী' যিনি তার পাপের কাজসমূহকে লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে শেষ দুটি আয়াতে তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্রত্যেকের জন্য সম্মানিত ফিরিশতাদের নিযুক্ত করেছেন, তাদের সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত ফিরিশতাদেরকে মানুষের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জানা ও লেখার শক্তি দিয়েছেন, যেমন তিনিও এগুলোকে জেনেছেন এবং নিজের নিকটে লাওহে মাহফুজে তাদের সৃষ্টির পূর্বেই লিখে রেখেছেন।

সাক্ষ্যদান (শাহাদাত)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, "নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো হক্ক ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত সমাগত, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ কবরে অবস্থিত সকলকে হিসাব দান ও পুরস্কার দেয়ার জন্য পুনরুত্থান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তার কিতাবে অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মারফত যা বলেছেন সবই সত্য। হে জ্ঞানবান, আমি আপনাকে ঐ

সাক্ষ্যদানের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়া এবং দাবী অনুযায়ী আমল করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এটিই পরিত্রাণের পথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জ্ঞান

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জেনেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহই আপনার রব, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আপনার কর্মের উপরে আপনাকে পুরস্কার দেয়ার জন্য পুনরুত্থান করাবেন। এখন জেনে নিন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনার ও সমগ্র মানুষের নিকট রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন। আপনাকে তাঁর আনুগত্য করতে ও অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটিও বলে দিয়েছেন যে, সঠিক ইবাদত সম্পর্কে জানতে হলে সেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করা ছাড়া এবং তাঁর কাছে প্রেরিত শরী'আত ব্যতীত আল্লাহর ইবাদতের কোনো রাস্তা নেই।

এ সম্মানিত রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা সমগ্র মানুষের উপর ওয়াজিব। যিনি সর্বশেষ রাসূল, তিনি সমগ্র মানুষের রাসূল। তিনি ঐ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা তাদের গ্রন্থ নিয়ে অবাঞ্ছিত খেলা ও পরিবর্তন- পরিবর্ধন শুরু করার পূর্বে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করত, তার মধ্যে চল্লিশোর্ধ্ব জায়গায় মূসা

(আ) ও ঈসা (আ) যার সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন।[৮]

তিনি ঐ সম্মানিত নবী, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের রিসালাতের ধারার সমাপ্তি টেনেছেন। সকল মানুষের কাছে তাঁকে পাঠায়েছেন। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশেমী আল কুরাইশী। আল্লাহর নবী ইসমাঈল (আ) ও আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আ) থেকে আগত বংশে পৃথিবীর সবচেয়ে বুনিয়াদী গোত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত ও সবচেয়ে সত্যবাদী। সর্বশেষ এ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মলাভ করেন। যে রজনীতে তিনি জন্ম লাভ করেন এবং যে সময় তিনি তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হন, তখন সুবৃহৎ আলোক রশ্মিতে জগত আলোচিত হয়েছিল। মানুষ থমকে গিয়েছিল। ইতিহাস গ্রন্থ আলোড়িত হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কাতে কাবার মধ্যে যে সমস্ত মূর্তিকে পূজা করত সেগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। পারস্য সম্রাট কিসরার রাজ সিংহাসন কম্পিত হয়েছিল। দশোধিক আলিন্দ ভেঙ্গে পড়েছিল। পারস্যবাসীরা যে অগ্নিকে পূজা করত, তা দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত অনির্বাপিত এ অগ্নি নিভে গিয়েছিল।

---

[8] শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন তায়মীয়া প্রণীত ‘আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, এর প্রথম খণ্ড ও আল্লামা মুহাম্মদ ইবনিল কাইয়িম প্রণীত হিদায়াতুল হায়ারা, সীরাতে ইবনি হিশাম, ইবনি কাছিরের ইতিহাস গ্রন্থের নবুওয়াতের অলৌকিক ঘটনাবলী অংশ দ্রষ্টব্য।

এ সমস্ত ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীর জন্য শেষ রাসূলের জন্মের ঘোষণা; তাতে বুঝা গিয়েছিল যে, তিনি অতি নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে মূর্তিকে পূজা করত তা ভেঙ্গে ফেলবেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকবেন এবং তারা এ সত্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবেন। যদি তারা এ দ্বীন গ্রহণে অবাধ্য হয় তাদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা জিহাদ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর এদেরকে সাহায্য করবেন। দুনিয়ার মধ্যে নূর স্বরূপ যে দ্বীন, তিনি তার প্রসার ঘটাবেন এ ছিল তারই পূর্বাভাস। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণের পরে বাস্তবে এটাই ঘটেছিল।

তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূল ভাইদের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

প্রথমত: তিনি সর্বশেষ রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো রাসূল বা নবী নেই।

দ্বিতীয়ত: তাঁর রিসালাতকে সার্বজনীন করে দেয় হয়েছে, সুতরাং সকল মানুষই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত। যিনি তাঁর আনুগত্য দেখাবেন এবং তাঁকে অনুসরণ করবেন, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর যিনি তার অবাধ্য হবেন তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। এমনকি ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণও তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য। যে তাঁর অনুসরণ করবে না, তাঁর প্রতি ঈমান

আনবে না সে মূসা (আ) ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীদেরকেও অস্বীকার করল। যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনুসরণ করবে না, মূসা (আ), ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কে নেই। কেননা, আল্লাহ তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া ও যখন আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করবেন তাদের উম্মতদের ও তাঁকে (মুহাম্মাদ) অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি যে দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন এটি সেই দ্বীন যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং এ সর্বশেষ সম্মানিত রাসূল এর যুগে সেটাকে পরিপূর্ণ ও সহজ করেছেন। **সুতরাং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে ইসলাম সহ প্রেরণের পরে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনকে গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা এটি পরিপূর্ণ দ্বীন, যা অন্যান্য সবকিছুকে রহিত করে দিয়েছে। আর এটি এমন দ্বীন যা আল্লাহ হেফাযত করেছেন।**

পক্ষান্তরে ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদ এগুলো তো বিকৃত মতবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যা নাযিল করেছেন সেভাবে তা অবশিষ্ট নেই। অতএব, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারী প্রত্যেক মুসলিম মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবী (আ) এর অনুসারী বলে গণ্য। আর ইসলামের বাইরের সবাই মূসা, ঈসা (আ) ও অন্যান্য সকল নবীর সাথে কুফরীকারী বা অস্বীকারকারী বলে বিবেচিত। যতই তারা মূসা ও ঈসা (আ) এর অনুসারী বলে দাবী করুক না কেন।

এজন্য ইয়াহূদী ধর্মযাজক ‘আহবার’ ও খৃষ্টান ধর্মযাজক “রুহবানের” মধ্যে যারা জ্ঞানী, ন্যায় নীতিবান, তাদের একটি গোষ্ঠী তাড়াতাড়ি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান ও ইসলামে প্রবেশের দিকে ধাবিত হয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু‘জিযা[9]সমূহ:

সীরাত তথা জীবনী বিশেষজ্ঞগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণকারী অলৌকিক ঘটনাবলী (মু‘জিযা) গণনা করেছেন। যার পরিমাণ এক হাজারেরও বেশী। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- নবুয়াতের সিলমোহর, যা তাঁর দুই কাঁধের উপর বিদ্যমান ছিল। সেটি ছিল তিলকের আকৃতিতে। তাতে ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ লেখা ছিল।
- গরমের মৌসুমে উত্তপ্ত সূর্যের মধ্যে হাঁটার সময় তাঁকে মেঘের ছায়া দান।
- তাঁর হাতের মধ্যে অবস্থিত পাথরের তাসবীহ পাঠ ও তাঁর প্রতি বৃক্ষের সালাম দান।

[9] মু‘জিযাকে কুরআনে ‘আয়াত’ বা নিদর্শন বলা হয়েছে। আর এটা বলাই বিশুদ্ধ। মু‘জিযা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ তাতে অলৌকিকত্ব থাকতে হয়।

- শেষ যুগে যা অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে তাঁর আগাম গায়েবী কথা জানানো। দেখুন, তিনি যেভাবেই বলেছেন সেভাবে একের পর এক এগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

  এগুলো ঐ সমস্ত অদৃশ্য জিনিস, যা তাঁর তিরোধানের পর থেকে নিয়ে দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনিও সেগুলো বর্ণনা করেছেন। এর সবগুলোই হাদীস গ্রন্থে ও কিয়ামতের আলামত সম্বলিত গ্রন্থে লেখা রয়েছে। এ বিষয়ে ইবন কাছির প্রণীত 'আন নিহায়াহ' ও 'আল আখবারুল মুশায়া ফী আশরাতিস সা'আহ এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ ও হাদীস গ্রন্থের 'ফিতান ও মালাহিম' অধ্যায়সমূহ দ্রষ্টব্য।

এ সমস্ত অলৌকিক নির্দশনাবলী তাঁর পূববর্তী নবীগণের অলৌকিক নিদর্শনাবলীরই অনুরূপ। তবে তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞানসম্মত অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন, যা যুগের ইতিহাসে দুনিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যা আল্লাহ অন্য নবীদের কাউকে দান করেন নি। সেটি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন (আল্লাহর বাণী), যা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। সূতরাং কোনো রদবদলকারীর হস্ত এদিকে বাড়ালেও কোনো কিছু করতে সক্ষম হবে না। যদি কেউ এক অক্ষর পরিবর্তনের চেষ্টা করে যা আমরা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেও মুসলিমদের হাতে শত শত বিলিয়ন কুরআনের কপি তো অবশিষ্ট রয়েছে যার একটিও অন্যটি থেকে এমনকি একটি অক্ষরও অন্যটির

অক্ষর থেকে পার্থক্য নেই। অপরদিকে তাওরাত ও ইঞ্জিল অসংখ্য। যার একটি কপি হতে অন্যটি ভিন্ন প্রকারের। কেননা, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে খেলায় মেতেছে যখন তাদের উপরে এ দুটোর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা একে রদবদল করে ছেড়েছে। অপরদিকে আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বে অন্য কাউকে নিয়োজিত না করে নিজেই নিজের উপরে দায়িত্ব রেখেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী”। (হিজর-৯)

নিশ্চয় আল-কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সম্পর্কে জ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও আল্লাহর বাণী থেকে দলীলাদি

কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এ সম্পর্কে (জ্ঞান সম্মত) প্রমাণাদির মধ্যে অন্যতম প্রমাণ এটি যে, পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উম্মতদের মত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারী কাফির কুরাইশদেরকে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। যখন তারা বলেছিল: কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কুরআনের সমতুল্য কিছু রচনা করে আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কুরআন তাদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাষী ও তাদের মধ্যে বড় বড় বাগ্মী বক্তা, অলংকার শাস্ত্রবিদ ও তুখোড় কবি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এর মত কিছু আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। অতঃপর এ কুরআনের মত দশটি সূরা রচনার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়। তারা এতেও ব্যর্থ হয়। অতঃপর একটি মাত্র সূরা আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়, তারা তাতেও ব্যর্থ হয়। অতঃপর তারা তাদের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে দেয়।

বস্তুত সমগ্র জ্বিন ও মানুষ একে অপরের সহযোগী হয়েও এর সমমানের কিছু আনতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেন-

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“তুমি বল যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ কুরআনের অনুরূপ আনার জন্য একত্রিত হয়, যদিও একে অপরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছুই আনতে সক্ষম হবে না”। (বনী ইসরাইল- ৮৮)

যদি কুরআন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা অন্য কোনো মানুষের বাণী হত তাহলে সে ছাড়া তার ভাষাভাষী অন্য শুদ্ধ বাগ্মী, এর অনুরূপ আনতে সমর্থ হত। কিন্তু এটি আল্লাহর বাণী। মানুষের বাণীর তুলনায় আল্লাহর বাণীর মার্যাদা ও মান তেমন সমুচ্চে যেমন সমুচ্চে তাঁর সত্তা মানুষের সত্তা থেকে।

আর যেহেতু আল্লাহর কোনো সদৃশ কিছু নেই তাই তার বাণীরও কোনো সৃদশ নেই। আর এর দ্বারাই পরিষ্কার হয় যে, নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল। কেননা, আল্লাহর বাণী তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে পছন্দকৃত রাসূলের মাধ্যম ছাড়া অবতীর্ণ হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী”। (আহযাব- ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨ ﴾ [سبا: ٢٨]

“আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শণকারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না”। (সাবা-২৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা তো তোমাকে কেবল সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি”। (আম্বিয়া-০৭)

আয়াতসমূহের সারমর্মঃ

প্রথম আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র মানব জাতির নিকটে তাঁর রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী, যার পরে আর কোনো নবী নেই। তাঁকে তিনি সর্বশেষ

রাসূল হিসাবে রিসালাত বহনকারী মনোনীত করেছেন। কেননা, তিনি জানেন, এ বিষয়ে তিনিই (মুহাম্মাদ) হচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তি।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন, তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সাদা-কালো, আরব-অনারব সকল মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষই সত্যকে জানে না; সে জন্য তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ এর অনুসরণ না করে কাফির হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করেন ও বলেন, নিশ্চয় তিনি তাকে নিখিল বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর রহমত, যা দ্বারা আল্লাহর মানুষদের উপর দয়া ও করুণা করেছেন। যে তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে অনুসরণ করবে, সে তার রহমতকে গ্রহণ করল। তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর যে মুহাম্মাদ এর উপর ঈমান আনবে না, তাঁকে অনুসরণ করবে না, সে আল্লাহর রহমতকে ফিরিয়ে দিল। সে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির হকদার হল।

আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান

হে জ্ঞানবান, আমরা আপনাকে রব হিসাবে আল্লাহর উপরে ঈমান, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনার দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর

মাধ্যমে যে শরী‘আত আল্লাহ পাঠিয়েছেন তদানুসারে আমল করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। সেটিই হচ্ছে দীনে ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা; যার উৎস হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন (আল্লাহর বাণী) এবং সর্বশেষ নবী-রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত বাণী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে নিরপরাধ বানিয়েছেন; সুতরাং তিনি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেননি এবং আল্লাহর নিষেধ ছাড়া কোনো কিছু নিষেধও করেন নি। তাই একাগ্র মন নিয়ে বলুন, “কেবলমাত্র আল্লাহকে রব্ব ও ইলাহ হিসেব গ্রহণ করে নিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম” আরও বলুন, “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে (সর্বশেষ) রাসূল মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করব”। কেননা, এছাড়া আপনার মুক্তির আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে সৌভাগ্যবান হওয়ার ও মুক্তি অর্জনের তাওফীক দান করুন। (আমীন)

তৃতীয় অধ্যায়

সত্য ও শাশ্বত দ্বীন (ইসলাম) সম্পর্কে জ্ঞান

হে জ্ঞানবান, আপনি যখন জেনেছেন যে, আল্লাহই আপনার রব, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আপনাকে রিযিক দান করেন, তিনি এক ও সত্যিকারের ইলাহ্ (উপাস্য) যার কোনো অংশীদার নেই। একক তাঁরই ইবাদত করা আপনার প্রতি ওয়াজিব এবং আরো জেনেছেন নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার নিকট ও সমগ্র মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ। অতঃপর জানুন, দ্বীন ইসলামকে জানা, তার উপর ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করা ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর উপরে সঠিক ঈমান আনা সম্ভব হবে না। কেননা, এটি এ দীন (জীবন ব্যবস্থা), যা আল্লাহ অনুমোদিত, যার নির্দেশ তিনি তাঁর রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যা দিয়ে নবীদের মধ্যকার শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমগ্র মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তার উপরে আমল করাকে ওয়াজিব করেছেন।

ইসলামের সংজ্ঞা

সর্বশেষ রাসূল ও সমগ্র মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً". متفق عليه.

“ইসলাম হচ্ছে- তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের ছিয়াম আদায় করবে, সামর্থ্যবান হলে কাবার হজ্জ আদায় করবে”। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম ঐ আন্তর্জাতিক দীন, যাকে গ্রহণের জন্য সমগ্র মানুষদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সকল রাসূলগণ এ দীনের উপরে ঈমান এনেছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাঁরা এ দীন গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহও ঘোষণা দিয়েছেন যে, এটিই সত্য দীন এবং এ দীন ব্যতীত অন্য কোনো দীনকে তিনি কারো থেকে গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ [ال عمران: ١٩]

“আল্লাহর নিকট মনোনীত দীনই হচ্ছে ইসলাম” (আলী ইমরান-১৯)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনকে অনুসন্ধান করে, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আল ইমরান-৮৫)

আয়াত দু'টির মর্মার্থ,

আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, ইসলামই হচ্ছে তাঁর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন তিনি কবুল করবেন না এবং শুধু মুসলিমরাই মৃত্যুর পরে সৌভাগ্যবান হবেন। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে, তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও জাহান্নামে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এজন্য সকল নবী আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের ইসলামের ঘোষণা দিয়েছেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করারও ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ পেতে ও সৌভাগ্যবান হতে চায়, তাদের ইসলামকেই গ্রহণ করা উচিৎ এবং রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারী হওয়া উচিৎ; যাতে তারা সত্যিকার অর্থে

মূসা, ঈসা (আ)-এর অনুসারী বলে গণ্য হয়। কেননা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ঈসা (আ) সকলেই আল্লাহর রাসূল, সকলেই মুসলিম। সকলেই ইসলামের দিকে মানুষদের ডেকেছেন। কেননা, এটিই আল্লাহর দীন, যা সহকারে তিনি তাদের সকলকেই পাঠিয়েছেন। কারো জন্য এটা সঠিক নয় যে, সে সর্বশেষ রাসূল প্রেরণের পরে দুনিয়ায় শেষ পর্যন্ত তার উপর ঈমান আনা ব্যতীত সে নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুসলিম হওয়ার দাবী করবে। কেননা, এ দাবী তখনই গ্রহণ করা হবে যখন সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ হতে পাঠানো রাসূল বলে ঈমান আনবে, তাঁর অনুসরণ করবে এবং তার উপরে অবতীর্ণ কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾ [آل عمران: ٣١]

"বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। (তাহলে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের পাপকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আলে ইমরান -৩১)

আয়াতের সারমর্ম:

যে আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, তাকে আল্লাহ আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ বলতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সত্যিকারে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। কেননা, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর রাসূল মাহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনবে ও তাকে অনুসরণ করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন না, তোমদের গুনাহ মাফ করবেন না। রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে নিখিল মানুষের কাছে যে ইসলাম পাঠানো হয়েছে, তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এটাই ক্ষমা সুন্দর ইসলাম, যাকে আল্লাহ পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য এটাকে দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাদের থেকে তিনি সেই দ্বীন ছাড়া অন্য দীন গ্রহণ করবেন না। তিনি এ সম্পর্কে সকল নবী ও ইসলামের প্রতি যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًاۚ﴾ [المائدة: ٣]

“আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমি আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।” (মায়িদাহ-৩)

আয়াতের সারমর্ম,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিমদের সাথে বিদায় হজ্জের সময় মক্কার আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহকে মনে মনে ও উচ্চস্বরে ডাকছিলেন। তখন আল্লাহ তার শেষনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এটি ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শেষ জীবনে, যখন তাকে তিনি সাহায্য করেছেন, ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পূর্ণতা লাভ করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা জানাচ্ছেন যে, তিনি নিশ্চয় মুসলিমদের জন্য তাদের দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে পাঠানো ও তাঁর উপরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি তাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে প্রদানা করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এর উপর তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। কখনও তিনি এ দীন ব্যতীত অন্য কোনো কিছু কারও কাছ থেকে গ্রহণ করবেন না।

মহান আল্লাহ আরো জানাচ্ছেন যে, নিশ্চয় তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরিত ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা সকল যুগে, সকল স্থানে, সকল উম্মতদের জন্য উপযোগী। এটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, সহজ সরল, ন্যায়সংগত, মংগলময় জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে

এর পদ্ধতি অতি স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ ও সরল সোজা। তাতে দীনী ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি তাতে রয়েছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাতে ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, বিচারনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি ও মানুষেরা তাদের পার্থিব জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন অনুভব করে এর মধ্যে এসবের সঠিক পদ্ধতি নিহিত রয়েছে। এর মধ্যেই মানুষের মৃত্যুর পরের পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলামের (রুকন বা) স্তম্ভসমূহ

পরিপূর্ণ যে ইসলাম সহকারে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন তা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১০] এগুলোর প্রতি ঈমান আনা ও যথাযথ পালন করা ছাড়া কেউ সত্যিকারের মুসলিম হয় না। সেগুলো হচ্ছে:

১. নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্য দেওয়া।

২. ছালাত প্রতিষ্ঠা করা

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. রমযানের ছিয়াম পালন করা।

৫ যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ: 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো হক্ক ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্য প্রদান:

---

[10] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "পাঁচটি জিনিষের উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই ও নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, রমদানের ছিয়াম আদায় করা, যাকাত প্রদান করা।" (বুখারী মুসলিম) কুরআনের প্রমাণাদি রুকনসমূহকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার সময় আলোচিত হবে।

নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই ও নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের বিশেষ অর্থ রয়েছে, মুসলিমের উপর যা জানা ও সেটা অনুযায়ী আমল করা ফরয।

কেননা, যে শুধু মুখে উচ্চারণ করে ও অর্থ জানে না এবং সে অনুযায়ী আমল করে না, সে এর দ্বারা কোনো লাভবান হয় না। (لا إله إلا الله) বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে, আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনিই সত্যিকারের ইলাহ, তিনি ব্যতীত সকল ইলাহই বাতিল। আর (إله) 'ইলাহ' এর অর্থ হচ্ছে মা'বূদ। বা উপাস্য (যার ইবাদাত করা হয়)।

আর তাই যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করল ও তার সাথে অন্যকে অংশীদার বানালো, যদিও তার এ মাবুদ কোনো নবী বা ওলী হোক না কেন। যদিও এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা ও তাদেরকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হোক না কেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তাদের নবী ও ওলীদের ইবাদত এ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতেই করত। বস্তুত এগুলো বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ; কেননা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর ওয়াসিলা গ্রহণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে ইবাদত করার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না; বরং নৈকট্য বা ওয়াসিলা গ্রহণ তো কেবলমাত্র আল্লাহর

নামসমূহ ও গুণাবলী এবং আমাদের ছালাত, দান, যিকর, ছিয়াম, জিহাদ, হজ্জ, মাতা পিতার প্রতি ভাল ব্যবহার প্রভৃতি নির্দেশিত উত্তম কাজসমূহ আর সম্মূখে উপস্থিত জীবিত মুমিন যদি তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে তাহলে সেই সেই কাজসমূহ ও দো'আ দ্বারাই করা যায়।

ইবাদতের প্রকারসমূহ: ইবাদতের অনেক প্রকার রয়েছে:

তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: **দো'আ:**

দো'আ হচ্ছে, এমন কিছু প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানানো, যা পূরণ করার সামর্থ্য আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। যেমন, বৃষ্টি দান, রোগীর আরোগ্য, যে বিপদ আপদ কোনো সৃষ্টজীব দূর করতে সক্ষম নয় তা দূর করান, জান্নাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া, সন্তান সন্ততি, রিযক, কল্যাণ প্রভৃতি চাওয়া।

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না। যদি কেউ মৃত হোক বা জীবিত হোক, কোনো সৃষ্ট জীবের কাছে এগুলো থেকে কিছু চায় তাহলে সে তার ইবাদাত করল। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তার নিকটেই দো'আ করতে নির্দেশ দিয়ে এবং দো'আ যে ইবাদাত তার সংবাদ প্রদান করে আর সেটাকে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যমুখী করবে সে জাহান্নামী হবে এ ঘোষণা প্রদান করে বলেন,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠ ﴾ [غافر: ٦٠]

"তোমাদের রব বলেছেন যে, আমার কাছে দো'আ কর। আমি তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত সম্পর্কে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (আল মুমিন-৬০)

অনুরূপভাবে আল্লাহকে ব্যতীত অন্য যাদের কাছে দো'আ করা হয় তারা নবী অথবা ওলী যাই হোক না কেন, তারা যে অন্যের লাভ বা ক্ষতির কোনো কিছুই মালিক নয়, একথা জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ٥٦ ﴾ [الاسراء: ٥٦]

"বল, তোমরা যাকে (মাবুদ) দাবী করছ, তাদেরকে আহ্বান কর, অথচ তারাতো তোমাদের কষ্ট দূর করা ও অবস্থা পরিবর্তনের যোগ্যতা রাখে না।" বনী ইসরাইলের ৫৬ আয়াতে ও তার পরবর্তী আয়াত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨ ﴾ [الجن: ١٨]

“এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহর জন্য (নির্ধারিত)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে ডেকো না।’ (সূরা জিন-১৮)

ইবাদতের প্রকারসমূহের অন্যতম হচ্ছে, যবেহ, মানত ও কুরবানী

ইবাদাতের মধ্যে যবেহ, মানত ও কুরবাণী পেশ করাও রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য কোনো মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য পশুর রক্ত প্রবাহিত করবে না। কুরবানী পেশ করবে না। কোনো কিছু মানত করবে না। আর তাই যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যেমন কবর অথবা জ্বিনের উদ্দেশ্যে যবেহ করল; সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করল এবং আল্লাহর অভিসম্পাতের অধিকারী হল। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন-

﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ۝١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“তুমি বল, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এ কাজেরই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম”। আল-আন‘আম-১৬২-১৬৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"لعن الله من ذبح لغير الله"

“যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন”। হাদীসটি সহীহ যা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি কেউ এ বলে মানত করলো যে, যদি আমি এ এ জিনিস অর্জন করি, তাহলে জনৈকের উদ্দেশ্যে অথবা জনৈক কবরের উদ্দেশ্যে এ পরিমাণ দান করব। তবে এ মানত শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি সৃষ্টের উদ্দেশ্যে মানত করা হয়েছে। আর মানত হচ্ছে ইবাদাত। আল্লাহ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে এটি বৈধ নয়। শরী‘আতসম্মত মানত হচ্ছে, আমি যদি ওমুক জিনিস প্রাপ্ত হই, তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অমুক মাল দান করব, অথবা অমুক ভাল কাজ করার মানত করছি।

ইবাদতের প্রকারসমূহের অন্যতম হচ্ছে, বিপদমুক্তি কামনা করা, সাহায্য চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা:

বিপদমুক্তি কামনা করা, সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করাও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে বিপদমুক্তি কামনা করা, সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

﴿ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥ ﴾ [الفاتحة: ٥]

“আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি”। (ফাতিহা-৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ ﴾ [الفلق: ١، ٢]

“তুমি বল, আমি প্রভাতের রবের কাছে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”। (ফালাক্ব-১,২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"إنه لا يُستغاث بي وإنما يُستغاث بالله"

“আমার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করা যায় না, উদ্ধার প্রার্থনা করা যায় একমাত্র আল্লাহর কাছে।” হাদীসটি সহীহ, যা ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

"**إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله**". حديث صحيح،

যখন কিছু চাও আল্লাহর কাছে চাও, যখন সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহর কাছেই কর”। হাদীসটি সহীহ, যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

জীবিত উপস্থিত মানুষের নিকটে সে যা করতে সামর্থ রাখে, এমন বিষয়ে বিপদ মুক্তির আহ্বান ও সাহায্য চাওয়া বৈধ। তবে আশ্রয় প্রার্থনা কোনো অবস্থাতে একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। কোনো মৃত ও অনুপস্থিত কারো কাছে বিপদে মুক্তির আহ্বান

ও সাহায্য প্রার্থনা কখনো ঠিক নয়। কেননা তিনি নবী অথবা ওলী অথবা ফিরিশতা যাই হউন না কেন বিপদ মুক্তির যোগ্যতা রাখেন না।

আর গায়িবি বিষয়াদি, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, যে গায়িব জানার দাবী করে সে কাফির। তাকে মিথ্যাবাদী বলা ওয়াজিব। গণকের গণনা করার পরে যদি সত্যিকারে তেমনি কিছু ঘটে যায় তা ঘটনাচক্রে ঘটে যায় (কাকতলীয়)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«من أتى كاهنًا أو عرَّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

"যে ব্যক্তি গণক অথবা ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে এল এবং সে যা বলল বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরে অবতীর্ণকৃত সব কিছুকে অস্বীকার করল।" এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন।

ইবাদতের আরও অন্যতম প্রকার হচ্ছে: ভরসা করা, কোনো কিছু পাওয়ার আশা ও অবনত হওয়া:

ভরসা করা, পাওয়ার আশা, বিনয় অবনত হওয়াও ইবাদাতের অন্তর্গত। সুতরাং মানুষ একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করবে না, কারও নিকট হতে কিছু পাওয়ার আশা করবে না। আল্লাহর কাছে ছাড়া বিনয়াবনত হবে না।

দুঃখের বিষয় যে, অনেক ইসলামধারীরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অনেক জীবিত অথবা অনেক কবরবাসীর কাছে দো'আ করার মধ্য দিয়ে শির্ক করে। তাদের কবরকে প্রদক্ষিণ করে। তাদের কাছে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা জানায়। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ ছাড়া অন্যেরই ইবাদত। এইরূপ কাজ যারা করে তার মুসলিমের দাবী করলেও, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বললেও, ছালাত আদায় করলেও, ছিয়াম পালন করলেও, আল্লাহর ঘরে হজ্ব করলেও তারা মুসলিম নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ ﴾ [الزمر: ٦٥]

"অবশ্যই তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকটে ওহী পাঠানো হয়েছিল এই বলে যে, যদি তুমি শির্ক কর, তোমার কর্ম বৃথা যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (সূরা যুমার-৬৫)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ [المائدة: ٧٢]

“প্রকৃত বিষয় এ যে, যে আল্লাহর সাথে শির্ক করে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। জাহান্নাম তার আবাসস্থল। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই”। (সূরা মায়িদা- ৭২)

তাছাড়া আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি মানুষদেরকে বলেন,

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠ ﴾ [الكهف: ١١٠]

“তুমি বলঃ আমি তোমাদের মত একজন মানুষ তবে আমার কাছে ওহী পাঠান হয় (এ মর্মে) যে, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ হচ্ছে একই ইলাহ। অতঃপর যে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সৎ কাজ করা এবং তার রবের সাথে অন্য কাউকে ইবাদাতে শির্ক না করা উচিত।” (সূরা আল-কাহাফ:১১০)

তারা সবাই মূর্খ তাদেরকে এ পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট আলেমগণ ধোঁকা দিয়েছে, যারা দ্বীনের কিছু শাখা প্রশাখা সম্পর্কে জানলেও দ্বীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছে। তারা তাদেরকে তাওহীদের অর্থ সম্পর্কে মূর্খ থাকার কারণে শাফা‘আত ও ওয়াসীলার নামে শির্কের দিকে আহ্বান জানায়। তাদের প্রমাণাদি হচ্ছে; কিছু আয়াতসমূহের ভুল ব্যাখ্যা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে প্রণীত নতুন পুরাতন মিথ্যা হাদীসসমূহ, বিভিন্ন

ঘটনাবলী ও শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত স্বপ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার এসব পথভ্রষ্টতা; যা তারা তাদের পুস্তকসমূহে সন্নিবেশিত করেছে। এটা এজন্য যে, প্রথম যুগের মুশরিকদের মত তারা দাদা ও পিতাদের অন্ধ অনুকরণ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি (অবৈধ খেয়াল খুশী) ও শয়তানের অনুসরণ করে।

বস্তুত: আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে 'ওয়াসীলা' তালাশ করতে বলেছেন তার বাণীতে,

﴿وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]

"আর তোমরা তাঁর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করো"। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৫] এখানে "ওয়াসীলা" শব্দের অর্থ হচ্ছে, "সৎ কাজসমূহ" যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, সালাত আদায় করা, সদকা প্রদান করা, সিয়াম পালন, হজ্জ আদায় করা, জিহাদ করা, ভাল কাজের নির্দেশ দান ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কে রক্ষা প্রভৃতি। এর বাইরে মৃতদের আহ্বান জানানো, বিপদাপদ ও মুসিবতে তাদের কাছে উদ্ধার কামনা করা তা তো আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদাত করারই নামান্তর। (ওয়াসীলার সাতে এর কোনো সম্পর্ক নেই।)

মুসলিমদের নবী ও আউলিয়াগণকে আল্লাহ যে শাফা'আত বা সুপারিশের অনুমতি দিবেন, যার উপর আমরা ঈমান এনে থাকি, তাও মৃতদের নিকট চাওয়া যাবে না, কেননা শাফা'আত কেবল

আল্লাহরই অধিকার; তার অনুমতি ছাড়া কারো জন্য তা অর্জিত হবে না। আর তাই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীগণ তা একমাত্র আল্লাহর কাছেই চায়, এ বলে যে, হে আল্লাহ, আপনার রাসূল ও আপনার সৎ বান্দাদেরকে আমার জন্য শাফা'আতকারী বানিয়ে দিন। তারা এটি বলেন না যে, হে অমুক, আমার জন্য শাফা'আত করুন। কেননা সে মৃত। আর মৃতের কাছে কক্ষনো কিছু চাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন,

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٤٤ ﴾ [الزمر: ٤٤]

“তুমি বল: সকল প্রকার শাফা'আত আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আসমান জমিনের একচ্ছত্র রাজত্ব তারই, অতঃপর তাঁরই দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।” (সূরা যুমার-৪৪)

ইসলাম বিরোধী হারাম বিদ'আত, আর যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ছহীহ সুনান গ্রন্থে সংকলিত ছহীহ হাদীসসমূহে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কবরের উপর মসজিদ বানানো, কবরে বাতি দেওয়া, কবরের উপরের ঘর তৈরী, কবর গাঁথা, কবরের উপরে লেখা, কবরে পর্দা চড়ানো, কবরস্থানে নামায আদায় প্রভৃতি। এগুলো থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা এগুলো কবরবাসীর ইবাদত করার অন্যতম বড় কারণ।

এ দ্বারা পরিষ্কার হয়েছে যে, অনেক দেশে কবরে যেমন মিসরের বাদওয়ী ও যায়নাব এর কবরে, ইরাকে জিলানীর কবর, কারবালা ও নজফের আহলি বাইতের দিকে সম্পৃক্ত কবরসমূহে ও অন্যান্য কবরসমূহে মূর্খরা কবরের তাওয়াফ ও কবর ওয়ালাদের কাছে প্রয়োজন পূরণ করা চাচ্ছে এবং তাদের সাথে ক্ষতি কিংবা উপকারের বিশ্বাস করছে তা আল্লাহর সাথে শির্ক করার শামিল।

এ দ্বারা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবরকে যে তাওয়াফ করা হয়, কবরবাসীর কাছে প্রয়োজনীয় জিনিষ চাওয়া হয়, তাদেরকে ভাল মন্দ করার যোগ্যতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয় প্রভৃতি শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তারা মুসলিম দাবী করলেও, ছালাত আদায় করলেও, ছিয়াম পালন করলেও আল্লাহর ঘরে হজ্ব করলেও আল্লাহ ছড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই ও মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল, একথা উচ্চারণ করলেও তাদের উপরোক্ত কাজ প্রমাণ করে তারা পথ ভ্রষ্ট মুশরিক। কেননা, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার রাসূল; এটাকে মুখে উচ্চারণ করলেই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। যতক্ষণ না সে এর অর্থ জানে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

অপর দিকে অমুসলিম প্রথমতঃ এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করে ও তাকে মুসলিম বলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত,

যতক্ষণ এটার পরিপন্থি কোনো কিছু তার থেকে প্রকাশ না পায়। যেমন- পূর্বে উল্লেখিত শির্কী কাজসমূহ। অথবা যতক্ষণ না ইসলামের ফরয কাজসমূহ তার কাছে বললে সে সেটাকে অস্বীকার করে। অথবা ইসলাম বিরোধী কোনো দ্বীনের প্রতি ঈমান আনে। নবী ওলীগণ[11] যারা তাদেরকে ডাকে তাদের থেকে বিপদে মুক্তি চায়, তাঁরা তাদের থেকে সম্পর্কহীন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা এবং নবী কিংবা ওলী ও অন্যান্যদের ইবাদাত পরিত্যাগের জন্য রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন।

আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী ওলীদের ভালবাসার অর্থ তাদের ইবাদাত করা নয়। কেননা তাদের ইবাদাত তাদের সাথে শত্রুতার নামান্তর। রবং তাদের ভালবাসা, তাদের অনুসরণ এবং তাদের পথে চলারই নাম। সত্যিকারের মুসলিম নবী ও ওলীদেরকে ভালবাসেন, তাদের ইবাদাত করেন না। আমরা ঈমান আনব যে, নিজেদের জান, পরিবার, সন্তান

---

[11] ওলী আল্লাহ হচ্ছে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তাঁর অনুগত রাসূলের অনুসারী। তন্মধ্যে কেউ কেউ তার ইলম ও অধ্যাবসয়ের কারণে পরিচিতি লাভ করেন, কেউ কেউ পরিচিতি লাভ করেন না। পরিচিত জন-মানুষ তাদেরকে সম্মান করুক তারা তা চায় না। সত্যিকারের ওলীরা নিজেদের ওলী বলে দাবী করে না। বরং তার অপরাধী হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোনো কাপড় বা সাজ সরঞ্জাম নেই। প্রত্যেকে আল্লাহর একত্ববাদী মুসলিম ও তার রাসূলের অনুসারী, তার যোগ্যতা ও আনুগত্যের মাপকাঠি অনুযায়ী সে আল্লাহর ওলীর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা পরিষ্কার হলো যে, যারা নিজেদেরকে ওলী বলে দাবী করে, লোকে তাদের বড় ভাববে ও সম্মান দেখাবে বলে তারা নির্ধারিত কাপড়ও পরে, তারা আল্লাহর ওলী নয়, তারা মিথ্যাবাদী।

ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলকে অধিক ভালবাসা আমাদের প্রতি ওয়াজিব।

মুক্তি প্রাপ্ত দল

সংখ্যায় মুসলিমরা অনেক। আসলে কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম। যে সকল দল নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তাদের সংখ্যা ৭৩টি। এ সমস্ত দলের লোকদের সংখ্যা হাজার মিলিয়ন। কিন্তু সঠিক মুসলিমের দল হচ্ছে একটি। তারা হচ্ছে, যারা আল্লাহকে এক জানে এবং আকীদাহ ও সৎ কাজ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথের অনুসারী। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক বাণীতে বলেছেন,

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة". قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»

“ইয়াহূদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে। খৃষ্টানেরা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে। এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে এবং একদল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেটি কোন দল? তিনি বললেন, তারা হচ্ছে আমি ও আমার ছাহাবী যে পথে রয়েছি; এ পথে যারা থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ যে আকীদার পথে ছিলেন তা হচ্ছে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল এ বিশ্বাস স্থাপন। একক আল্লাহর নিকটে দো‘আ করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই জবেহ ও মানত করা। একমাত্র আল্লাহরই কাছে বিপদ মুক্তি কামনা করা, সাহায্য চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ভালমন্দ একমাত্র তিনিই করতে পারেন; এ আকীদা পোষণ করা। আর আল্লাহ সুবহানাহুর উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে ইসলামের স্তম্ভসমূহ (আরকান) আদায় করা। ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পুনরুত্থান, হিসাব কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, ভালমন্দ সকল তাকদীরই আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাকে বিশ্বাস করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। এ দু'য়ের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর ওলীদের সাথে বন্ধুত্ব ও তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখা। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো। তাঁর রাস্তায় এক হয়ে জিহাদ করা। মুসলিমদের শাসকদের সৎকাজের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য দেখানো ও যেখানেই অবস্থান করা হউক না কেন সত্য কথা বলা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবার ও পরিজন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছাহাবীগণকে ভালোবাসা। তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঝগড়া সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা। কিছু মুনাফিক

তাদেরকে যে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে, তা বিশ্বাস না করা। তাদের এ সমালোচনা ছিল মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কিছু সংখ্যক আলিম ও ঐতিহাসিকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। হয়তবা তারা পুস্তকাদিতে ভাল নিয়তে সাহাবীদের পারস্পরিক এ ঝগড়াকে উল্লেখ করেছে। বস্তুতঃ এটি ঠিক কাজ হয়নি।

আর যারা দাবী করে যে, তারা আহলে বাইতের এবং তারা নিজেকে 'সাইয়্যিদ' বলে আখ্যায়িত করে, তাদের উচিৎ এ বংশ পরম্পরা সম্পর্কে সঠিক তথ্য অর্জন করা। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে সম্বন্ধকারীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। যদি তারা আহলে বাইতের বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে, তাওহীদকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একত্ববাদকে ইখলাছের সাথে গ্রহণ করা, গোনাহ বর্জন করা, নিজেদের সামনে মানুষের মাথা নত করা ও হাতে পায়ে চুমু খাওয়ার প্রতি খুশী না হয়ে এবং মুসলিম ভাইদের ছেড়ে ভিন্ন কোনো পোশাক পরিধান না করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সত্যিকার পরিবার-পরিজনের অনুকরণ-অনুসরণ করা। কারণ এসবই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বিরোধী কাজ। তিনি এসব কাজ থেকে সমপূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। বরং আল্লাহর কাছে সেই মর্যাদার অধিকারী, যে যত বেশী তাকওয়ার অধিকারী।

আর আল্লাহ দুরূদ ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর। (আমীন)

নির্দেশ প্রদান ও শরী‘আত (জীবন পদ্ধতি) প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত।

আর যেখানেই আল্লাহর শরী‘আতের বাস্তবায়ণ হয়েছে সেখানেই রয়েছে ইনসাফ, রহমত ও মর্যাদা

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই’ এ কালেমার অর্থসমূহের একটি অর্থ রয়েছে, যার উপরে ঈমান আনা ও আমল করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, নির্দেশ দান ও শরী‘আত প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা কোনো মানুষের জন্য জায়েয নেই, তা যে বিষয়েই হোক না কেন। অনুরূপভাবে কোনো মানুষের জন্য জায়েয হবে না আল্লাহর শরী‘আত বিরোধী কোনো বিচার ফায়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকা। তদ্রূপ কারও জন্য এটা জায়েয নেই যে, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃতকে হালাল করা ও হালালকৃতকে হারাম করা। অতঃপর যে ইচ্ছা করে আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করে তা করবে অথবা আল্লাহর শরী‘আতের বিরোধিতার উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]

“আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির।” (সূরা মায়িদা-৪৪)

আর আল্লাহ যে সমস্ত কাজ দিয়ে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে: একত্ববাদের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই এর প্রতি আহ্বান করা এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করা। এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং সৃষ্টের ইবাদাত ও তাদের শরী'আত (বিধি-বিধান) এর গণ্ডি থেকে বের হয়ে একক ও অংশীদারহীন স্রষ্টার শরী'আতের দিকে মানুষদের ফিরে আসার দাওয়াত দেওয়া।

যিনি গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে মহাগ্রন্থ কুরআন পড়েছেন ও অন্ধ অনুকরণ থেকে দূরে অবস্থান করেছেন, তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যা আমরা বললাম সেটাই সঠিক এবং আরো উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও মানুষদের সথে অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তার সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সম্পর্ক এভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তারা যাবতীয় ইবাদাতের প্রকার দিয়ে তাঁরই ইবাদাত করবে; অন্য কারও জন্য সেগুলোর কোনো কিছুই নিবেদন করবে না। আর আল্লাহর নবীদের ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন এ ভাবে যে, তারা তাদেরকে ভালোবাসবে, তবে সে ভালোবাসা হবে আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী। আর মানুষদের তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের সাথে আল্লাহর দুশমন কাফিরদের সম্পর্ক হবে শত্রুতার সম্পর্ক। কেননা আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। আর তাদের সাথে সম্পর্কের অন্য রূপটি

হচ্ছে, তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো। তাদের সম্মুখে ইসলামকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা, হতে পারে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। যদি তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর বিচার ফায়সালা মানতে রাজি না হয়, তাহলে ফিতনা অনুষ্ঠিত না হয়ে সকল দ্বীন আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ করা। এটাই হচ্ছে কালিমাতুত তাওহীদ; (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর অন্যতম অর্থ। প্রত্যেক মুসলিমের উপর সঠিক মুসলিম হওয়ার জন্য এটাকে জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্য দানের অর্থ

নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে, আপনি জানবেন ও এ আকিদা (বিশ্বাস) পোষণ করবেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তিনি বান্দাহ, উপাস্য নন। তিনি রাসূল, মিথ্যা বলেন না, আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য ও অনুসরণ করার যোগ্য, যে তার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে আর যে তার নাফরমানী করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আপনি আরও জানবেন ও বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদত হোক, বিচার পদ্ধতি হোক অথবা হালাল-হারাম নির্ধারণ সম্পর্কিত হোক, আপনি কোনো শরী‘আতই গ্রহণ করতে পারবেন না, যতক্ষণ

না তা রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। কেননা তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর শরী'আত প্রচারক। সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কোনো পথে আনা শরী'আত বা আইন গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴾ [الحشر: ٧]

"রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা' আঁকড়ে ধর। তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।" (হাশর- ১৭)

তিনি আরো বলেছেন-

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ, তারা তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত পারস্পরিক ঝগড়ার বিষয়ে তোমাকে বিচারক না মানা এবং যা তুমি ফয়সালা দিবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোনো দ্বিধা পাওয়া না যাওয়া এবং পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তারা মুমিন হবে না"। (সূরা নিসা- ৬৫)

আয়াত দুটির অর্থ- প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ মুসলিমদের তার রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যত নির্দেশ

দিয়েছেন তার আনুগত্য করতে ও যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হুকুম দিয়েছেন। কেননা তিনি আল্লাহর নির্দেশেই নির্দেশ দেন ও তার নিষেধেই নিষেধ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজে স্বয়ং নিজের শপথ করে বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনার দাবী ততক্ষণ সঠিক হবে না, যতক্ষণ তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিচারক না মেনে নিবে এবং তাঁর ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট হবে ও পূর্ণভাবে তা গ্রহণ করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»

“যে কেউ এমন কিছু করবে যার উপরে আমাদের শরী‘আত নেই, তা প্রত্যাখ্যাত, (এ হাদীসটি মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে)

এ সাক্ষ্য দানের অনিবার্য আহ্বান:

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ জেনেছেন এবং আরো জেনেছেন যে, এ সাক্ষ্যই হচ্ছে ইসলামের চাবি এবং মূল ভিত্তি; যার উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিশুদ্ধ মন নিয়ে বলুন- ‘আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়

আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।" দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল লাভের জন্য ও মৃত্যুর পরে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করুন।

আরও জেনে নিন, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল; এ সাক্ষ্য দানের অনিবার্য দাবীই হচ্ছে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভের উপরেও আমল করা। কেননা আল্লাহ এ সকল স্তম্ভকে তাঁর উদ্দেশ্যেই ইখলাছের সাথে পালনের মাধ্যমে তাকে ইবাদত করা ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ স্তম্ভগুলোর কোনো এক স্তম্ভকে শরী'আতে গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া পরিত্যাগ করল, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থকে অপূর্ণ রাখল। আর তাই তার এ সাক্ষ্য সঠিক বলে বিবেচিত হবে না।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ

ছালাত

হে জ্ঞানবান, জেনে নিন, ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত। আর তা হচ্ছে রাত-দিনে পাঁচ সালাত। যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শরী'আতবদ্ধ করেছেন। তাতে তাদের রব আল্লাহর সাথে একান্তে আলাপচারিতা চালাবে, তাকে আহ্বান করবে, আর এ ছালাতের মাধ্যমে তারা অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকবে। ফলে এর মাধ্যমে তাদের মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি অর্জিত হবে, যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণময় করবে।

আল্লাহ ছালাতের জন্য শরীর, কাপড় ও ছালাতের স্থান পবিত্র হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং মুসলিম অপবিত্রতা যেমন পেশাব, পায়খানা প্রভৃতি থেকে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবেন, যাতে তার শরীর বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে ও অন্তর আভ্যন্তরীন অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়।

বস্তুত ছালাত হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের উপরে এটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করা ওয়াজিব। পরিবার পরিজন ও সন্তানের বয়স সাত বছর হতেই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দেওয়া মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴾ [النساء: ١٠٣]

“নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় মুমিনের উপর ফরজ।” (সূরা নিসা- ১০৩)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন-

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝ ﴾ [البينة: ٥]

“আর ইখলাসের সাথে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা, ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ছাড়া তাদেরকে অন্য নির্দেশ দেওয়া হয় নি। বস্তুত এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।” (আল-বায়্যিনাহ-৫)

আয়াত দুটির সারমর্ম হচ্ছে, প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, ছালাত মুমিনের উপরে অত্যাবশ্যকীয় ফরজ। নির্ধারিত সময়ে এগুলো আদায় করাও তাদের উপরে অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন, নিশ্চয় মানুষদেরকে সে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহরই তারা ইবাদাত করবে, তাঁরই উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদাতকে বিশুদ্ধ করবে, ছালাত কায়েম করবে এবং হকদারদেরকে যাকাত প্রদান করবে।

আর ছালাত সব অবস্থাতেই এমনকি ভীত সন্ত্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাতেও মুসলিমের উপরে ওয়াজিব। যে কোনো অবস্থায় তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে। কিন্তু যদি তাও অসম্ভব হয় কেবল চোখ অথবা কলবের দ্বারা ইশারা করে তা আদায় করার সুযোগ থাকে তো ইশারার মাধ্যমেও তিনি ছালাত আদায় করবেন। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ছালাত পরিত্যাগকারী পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক সে মুসলিম নয়। তিনি বলেন-

"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

“আমাদের ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি তা হচ্ছে ছালাত, যে এটি পরিত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেলো।” (ছহীহ হাদীস)

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হচ্ছে, ফজরের ছালাত, জোহরের ছালাত, আছরের ছালাত, মাগরিবের ছালাত ও ‘ইশার ছালাত।

ফজরের ছালাতের সময় পূর্বগগণে প্রভাত রশ্মি প্রকাশের থেকে শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের সময় শেষ হয়। শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়। জোহরের সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং প্রত্যেক জিনিষের ঢলে যাওয়ার সময়ের ছায়া বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে। আছরের সময় জোহরের পর থেকে শুরু হয় এবং সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়

বরং সূর্য একেবারেই সাদা অবস্থায় থাকতে এটি আদায় করতে হবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং লাল শাফাক (আবীর রঙের আভা) অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা ঠিক নয়। আর ইশার ছালাত মাগরিবের ছালাতের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় ও অর্ধরাত্র পর্যন্ত থাকে এবং এর পরে আর দেরী করা যায় না। মুসলিম যদি অনিচ্ছাকৃত শরী'আতসম্মত ওজর ব্যতীত এক সময়ের ছালাতকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে দেরী করেন, তাহলে তিনি বড় পাপে পতিত হলেন। তার উচিৎ আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এর পুনরাবৃত্তি না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]

"যে সকল ছালাত আদায়কারীরা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন তাদের জন্যই ধ্বংস (অবধারিত)"। (মাউন-৪, ৫)

ছালাতের হুকুম আহকাম

প্রথমত: পবিত্রতা

ছালাত আরম্ভ করার পূর্বেই মুসলিমের জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। সুতরাং প্রথমে বহির্গমন রাস্তা দিয়ে যদি প্রস্রাব-পায়খানার কিছু বের হয় তা পরিষ্কার করে পরে ওযু করতে হবে।

আর ওযু করতে হবে, মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করে, তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ সেটা ভালোভাবেই জানেন, আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযুর জন্য মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। আর বিসমিল্লাহ বলবে, অতঃপর কুলি করতে হবে। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পরে সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করতে হবে। অতঃপর ডান থেকে শুরু করে দুই হাত দুই বাহুসহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ মাথা ও দুই কান দুই হাত দ্বারা মাসেহ করতে (হাত বুলিয়ে নিতে) হবে। অতঃপর ডান থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত পা ধৌত করতে হবে।

আর যদি পবিত্রতা অর্জনের পরে প্রস্রাব অথবা পায়খানা অথবা বাতাস বের হয় অথবা ঘুম বা অজ্ঞান হওয়ার কারণে জ্ঞান লোপ পায়, তাহলে ছালাত আদায় করতে চাইলে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। মুসলিম পুরুষ বা মহিলার যৌন উত্তেজনা বশত যদি বীর্যপাত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় হলেও পবিত্রতার জন্য সম্পর্ণ শরীর পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। মহিলা যখন হায়িয অথবা নিফাস থেকে পবিত্র হবেন, তার সমস্ত শরীর ধৌত করে পবিত্র হতে হবে, কেননা হায়িযগ্রস্তা ও নিফাসগ্রস্তার নামায ঠিক নয়। পবিত্র না হওা পর্যন্ত তার উপর ছালাত ওয়াজিব নয়। আল্লাহ হায়িয ও নিফায অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ছালাত কাযার ব্যবস্থা না রেখে তাদের উপরে সহজ করেছেন। ছালাত ছাড়া অন্য যা কিছু এ অবস্থায় তারা করতে সক্ষম হন নি, পুরুষের মত তা কাযা ওয়াজিব।

পানির অবর্তমানে অথবা পানি ব্যবহারে রোগাক্রান্ত হতে পারে, এমন রোগাক্রান্ত অবস্থায় তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। **তায়াম্মুমের পদ্ধতি হচ্ছে,** মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করে পরে দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে ও তাদ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ডান হাতের পিঠ বাম হাতের পেট ও বাম হাতের পিঠ ডান হাতের পেট দ্বারা মাসেহ করতে হবে। পানি না থাকা বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, হায়িয ও নিফাসগ্রস্তা ও অপবিত্র যারা অজু করতে চায়, এভাবেই তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয়ত: ছালাতের পদ্ধতি

১. ফজরের সালাত:

ফজরের নামায দুই রাক'আত। পুরুষ অথবা মহিলা মুসলিম কিবলামুখী হবেন। কিবলাহ হচ্ছে মক্কার মসজিদে হারামে অবস্থিত কা'বা। মনে মনে এ নিয়ত করবেন যে, ফজরের ছালাত আদায় করছি। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করবেন না। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ) বলে তাকবীর বলবেন। অতঃপর উদ্বোধনী দো'আ পাঠ করবেন। এর মধ্যে অন্যতম দো'আ হচ্ছে-

"سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

“আপনি পবিত্র। হে আল্লাহ, আপনার প্রশংসা দ্বারা, (শুরু করছি) আপনার বরকত, আপনার মর্যাদা সর্বোচ্চ, আপনি ব্যতীত সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই।”

তারপর “আউযুবিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজীম” (আপনার কাছে আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) বলবে। অতঃপর ফাতিহাতুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়বেন, সেটি হচ্ছে-

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧]

“বিশ্ব জগতের রব্ব আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। যিনি পরম দাতা ও পরম দয়ালু। বিচার দিনের বাদশাহ, আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে সোজা পথ দেখান। তাদের পথ যাদের উপরে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। যাদের প্রতি আপনি রাগান্বিত নন। যারা পথভ্রষ্টও নয়।”

আর অবশ্যই কুরআন সাধ্যানুযায়ী আরবী ভাষায় পড়বেন।[১২] অতঃপর বলবেন ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং মাথাও

[12] কেননা, যদি কুরআন আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় পড়া হয় তাহলে তা কুরআন হয় না। কারণ, কুরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ হয় না। শব্দাবলীর অর্থের অনুবাদ হয়। কারণ, এর অক্ষর ও শব্দসমূহকে অনুবাদ করা হলে তার অলংকার ও তার চ্যালেঞ্জ অবশিষ্ট থাকে না| এমনকি, এর ফলে

পিঠ নিচু অবস্থায় সমন্তরাল করে দু'হাত দ্বারা দুহাঁটুকে আঁকড়ে ধরে রুকু করবেন তখন বলবেন- 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম' (আমার মহান রব অতি পবিত্র) অতঃপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন তিনি তা শুনেছেন) বলে উঠবেন। সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং বলবেন- 'রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা) এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলবেন এবং পায়ের আংগুলের কিনারা, দুহাঁটু, দুহাত, চেহারা ও নাক মাটিতে লাগিয়ে সিজদাহ করবেন। অতঃপর সিজদায় গিয়ে বলবেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (আমার সর্বোচ্চ রব অতি পবিত্র) এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে বসবেন এবং বসার সময় 'রাব্বিগফির লী' (হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন) বলবেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলবেন এবং দ্বিতীয়বার মাটির উপরে সিজদাহ করবেন এবং বলবেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (আমার সর্বোচ্চ রব অতি পবিত্র)। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর পুনঃরায় প্রথম রাক'আতের মত সূরা ফাতিহা অর্থাৎ 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়বেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। রুকু করবেন; রুকু থেকে উঠবেন। সিজদাহ করবেন, এরপর বসবেন, অতঃপর দ্বিতীয় সিজদাহ করবেন এবং এর প্রতিটি জায়গায় প্রথম বার যা পড়েছিলেন তাই পড়বেন। অতঃপর বসা অবস্থায় পড়বেন,

---

অক্ষরও বাদ পড়ে যায় এবং একে আরবী ভাষায় কুরআন বলা যায় না।

"التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللّٰهُمَّ صلى الله عليه وسلم على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".

“মৌলিক, শারীরিক ও আর্থিক সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার উপর শান্তি আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ আপনি আপনি দরুদ পেশ করুন মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, যেমন বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপরে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদার অধিকারী।” অতঃপর ডান দিকে ফিরাবেন এ বলে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, (আপনাদের উপরে শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) অতঃপর বাম দিকে ফিরবেন ও বলবেন- ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি।’ (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। এর মাধ্যমে ফজরের ছালাত পরিপূর্ণ হল।

২. অপরদিকে জোহর, আছর ও শেষ সালাত ঈশার সালাত:

এ সালাতগুলোর প্রত্যেকটিই চার রাক‘আত। প্রথম দু রাক‘আত পড়বেন ফজরের দুই রাক‘আতের মত। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতের পরে যখন তাশাহহুদের জন্য বসবেন, তখন ফজরের সালাতের সালামের পূর্বে বসে যা পড়তেন তা পড়ার পর সালাম ফিরাবেন না, বরং প্রথম দু’ রাক‘আতের মত আরও দু’ রাক‘আত পড়বেন। তারপর দ্বিতীয়বার তাশাহুদের জন্য বসবেন ও যা প্রথম বৈঠকে পড়েছিলেন তা পড়বেন এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরে দরূদ পড়বেন। এরপর ডান দিকে ও বাম দিকে ফজরের ছালাতের মত সালাম ফিরাবেন।

৩. অপরদিকে মাগরিবের ছালাত, তা তো তিন রাক‘আত:

যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তেমনিভাবে দুই রাক‘আত আদায় করবেন। অতঃপর বসবেন ও পূর্ব বর্ণিত ছালাতসমূহে যা পড়েছেন তা পড়বেন। তবে সালাম ফিরাবেন না বরং উঠে দাঁড়াবেন। অতঃপর তৃতীয় রাক‘আতে অন্যান্য ছালাতে যা পড়েছেন তাই পড়বেন। অতঃপর ডানে বামে সালাম ফিরাবেন। আর সালাত আদায়কারীর জন্য উত্তম হচ্ছে রুকু ও সেজদার দো‘আ কয়েকবার পড়া।

পুরুষদের জন্য এ পাঁচ ফরয ছালাত মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব। যার কুরআন পাঠ উত্তম, ছালাত সম্পর্কে বেশি জানেন এবং দ্বীন সম্পর্কে যোগ্য, সেই তাদের মধ্যে ইমাম হবেন। ইমাম রুকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় ফজরের দুই রাক‘আত, মাগরিব ও

ইশার প্রথম দুই রাক‘আতে কুরআন উচ্চস্বরে পড়বেন এবং তা পিছনের মুসল্লী শুনবেন।

মহিলাগণ ঘরে পর্দা ও হিফাজত সহকারে ছালাত আদায় করবেন। নিজের সমস্ত শরীর এমনকি দুই হাত দুই পাও ঢেকে নিবেন, কেননা শুধুমাত্র তার চেহারা ব্যতীত সবই সতর (যা আবৃত করা অত্যাবশ্যক) তাদেরকে পুরুষের থেকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দিতে হবে। কেননা চেহারা দেখানোর মাধ্যমে ফিতনা ছড়ায়, এর মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে এবং কষ্ট দেওয়া হবে। আর যদি মুসলিম নারী মসজিদে ছালাত আদায় করতে চান, তবে তাতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু এ শর্তে যে, পর্দা সহকারে বের হবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না, পুরুষের পিছনে ছালাত আদায় করবেন। যাতে তারা পুরুষদের আর পুরুষরা তাদেরকে ফিতনায় ফেলতে না পারেন।

মুসলিমদের উচিৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে অতীব বিনয় অবনতচিত্তে ভীত সন্ত্রস্ত ও অন্তরের গভীর মনোযোগের সাথে ছালাত আদায় করা, দাঁড়ানো, রুকু করা ও সিজদাহ অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পন্ন করা। তাড়াতড়ি করবে না। অহেতুক কিছু করবে না। আসমানের দিকে তাকাবে না। কুরআন পাঠ ব্যতীত কথা বলবে না।[১৩] ছালাতের যিকর

---

[13] তবে যদি কেউ কাউকে সাবধান করতে চান বা ভুল সংশোধন করতে চান তখন “সুবহানাল্লাহ” বলবেন। এটা শুধুমাত্র মুক্তাদী ইমামকে কিছু ভুল করলে, কম করলে সাবধানতার জন্য এবং মুসল্লী উদাহরণস্বরূপ কাউকে ডাকার জন্য বলতে পারেন। আর মহিলারা সাবধান করার জন্য তালি দিবেন, কথা বলবেন না। কেননা, তাদের স্বরে ফিতনার ভয় থাকে।

যথার্থ জায়গায় পড়বেন। কেননা আল্লাহ তাঁর যিকির প্রতষ্ঠার জন্যই ছালাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জুম’আর দিন মুসলিমরা দুই রাকাত ছালাত আদায় করবেন। ফজরের নামাযের মত ইমাম সাহেব এ উভয় রাক‘আতেই কুরআন উচ্চস্বরে পড়বেন। ছালাতের পূর্বে দুটি খুৎবা (বক্তৃতা) দিবেন। এর মধ্যে মুসলিমদেরকে তাদের করণীয় স্মরণ করিয়ে দিবেন। তাদেরকে দ্বীনের বিষয়াদি শিক্ষা দিবেন। পুরুষদের জন্য ইমামের সাথে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। জুম’আর দিনে এটিই হচ্ছে জোহরের ছালাত।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত

ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হলো, মালের যাকাত প্রদান করা। প্রত্যেক মুসলিম যারা নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রতি বছর তাদের মাল থেকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ফকীর বা অন্যান্য যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয, সে সকল হকদারদের আপনি যাকাত প্রদান করবেন।

স্বর্ণের নির্ধারিত নেছাব হচ্ছে, বিশ মিছক্বাল। [প্রায় ৮৫ গ্রাম] রৌপ্যের নেছাব হচ্ছে, দুইশত দিরহাম [প্রায় ৫৯৫ গ্রাম] অথবা এর সমমানের কাগজের টাকা, ব্যবসার মালপত্র। ব্যবসার বিভিন্ন মালপত্রের মূল্য যখন নেছাব পরিমাণ পৌছাবে তখন এক বছর অতিক্রম করলে এর মালিকের উপর যাকাত ওয়াজেব হবে। শস্য ও ফলের নেছাব তিনশত ছা' [প্রায় ৬১২ কিলোগ্রাম]। যে জমি বিক্রয়ের জন্য তৈরী করা হয়েছে, তার মূল্য মানের যাকাত দিতে হবে। ভাড়ার জন্য তৈরী সম্পদের ভাড়ার উপরেই যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ রৌপ্য ও ব্যবসায়িক মালের যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি বৎসর শতকরা ২.৫ (উশরের চারভাগের একভাগ)। নদীর পানি, প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা বৃষ্টির পানির দ্বারা কষ্ট ব্যতীত কোনো শস্যক্ষেত্রে বা ফলের বাগানে পানি সরবরাহ সম্ভব হলে উৎপাদিত শস্য ও ফলের যাকাত হবে শতকরা ১০% দশভাগের একভাগ (উশর)। তবে কূপ থেকে বালতি দ্বারা পানি সেচের মত কষ্টসাধ্য

উপায়ে উৎপাদিত শস্য ও ফলের যাকাত দিতে হবে শতকরা ৫% বিশভাগের একভাগ (উশরের অর্ধেক)।

ফসল ও ফলের যাকাত প্রদানের সময় হচ্ছে, তা সংগ্রহের সময়। যদি বৎসরে দুইবার অথবা তিনবার তা সংগ্রহ করা হয় তা হলে প্রতিবারই যাকাত প্রদান করতে হবে। উট, গরু ও ছাগলের যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে ইসলামী হুকুম-আহকামের কিতাবসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তা সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾ [البينة: ٥]

"তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদাত করতে, ছালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। বস্তুত এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।" (সূরা আল বাইয়্যিনাহ-৫)। বস্তুত যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, দরিদ্রদের আত্মপ্রশান্তি, তাদের প্রয়োজন মিটানো এবং তাদের ও ধনীদের মাঝে জোরদার সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

ইসলাম সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মুসলিমদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার বিষয়কে শুধুমাত্র যাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং আল্লাহ ধনীদের উপর দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রদের প্রতিপালনকে ওয়াজিব করেছেন। মুসলিম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন আর তার

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকবেন, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) প্রদানকে মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব করা হয়েছে। এটি হচ্ছে প্রতিজনের জন্য এমনকি শিশু ও চাকরের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে যা শহরে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের এক ছা [২০৪০ গ্রাম] পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান। এমনকি যদি কোনো মুসলিম কিছু করার শপথ করে তা না করেন, তাহলে আল্লাহ সেই মুসলিমের উপরে শপথ ভংগের কাফফারা[১৪] ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ নফল দান খয়রাতের প্রতি মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর রাস্তায় ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। তাদের ছাওয়াবকে দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বা অনেক বেশি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

[14] শপথ ভংগের কাফফারা হচ্ছে একটি দাস মুক্ত করা অথবা ১০ জন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা কাপড় পরানো। এগুলো সম্ভব না হলে তিন দিন রোযা রাখতে হবে।

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ ছিয়াম

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে, রমযান মাসের ছিয়াম পালন করা। রমযান মাস হিজরী সনের মাসসমূহের নবম মাস।

রমযান মাসের ছিয়াম পালনের করণীয় হচ্ছে-

মুসলিম সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই ছিয়াম পালনের নিয়ত করবেন, অতঃপর পানাহার ও সহবাস (যৌন মিলন) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবেন, এরপর ইফতার করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোটা রমযান মাসের দিনগুলোতে এইরূপ করতে থাকবেন।

ছিয়াম অগণিত উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে,

১. এটি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশ পালন। বান্দাহ তার যৌন ইচ্ছা ও পানাহার আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে। এটি হচ্ছে, আল্লাহর তাক্ওয়া অর্জনের বড় কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম।

২. অপরদিকে রোযার স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকারিতাও রয়েছে অনেক, যা ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস সহকারে ছিয়াম পালনকারীরাই উপলব্ধি করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতই ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” (সূরা বাকারাহ: ১৮৩)

অবশেষে আল্লাহ বলেন,

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“এটা ঐ রমযানের মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য হিদায়াত বা প্রকাশ্য সঠিক রাস্তা। হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। অতঃপর যে এ মাস পাবে সে যেন ছিয়াম পালন করে। কিন্তু যে রোগগ্রস্ত অথবা সফর অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনগুলিতে এটি পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না, যাতে তোমরা এর দিনগুলো পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।” (সূরা বাকারা ১৮৩-১৮৫)

ছিয়ামের যে সমস্ত হুকুম আহকাম আল্লাহ কুরআনে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীছে বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. রোগী ও মুসাফির যে কয়দিন ছিয়াম পালন করেন নি রমযানের পরে ঐ কয়দিন ছিয়াম আদায় করবেন।

২. তেমনি হায়েযগ্রস্তা ও নিফাসগ্রস্তাগণও। এদের জন্য ছিয়াম রাখা ঠিক নয়। যে কয়দিন তারা ছিয়াম ভেঙ্গেছে পরে সেই কয়দিন ছিয়াম রেখে নিবেন।

৩. ঠিক তেমনি যদি গর্ভবর্তী ও দুগ্ধবতী মা তাদের জীবন ও তাদের বাচ্চার জীবন-নাশের আশংকা করে, তাহলে ছিয়াম কাদ্বা (কাযা) করবেন।

৪. রোযাদার ভুল করে খেলে ও পান করলে পরে স্মরণ হবে তাঁর ছিয়াম শুদ্ধ হবে। কেননা, ভুল ভ্রান্তি ও জোর-জবরদস্তির কারণে কিছু করলে উম্মতে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য আল্লাহ মাফ করেছেন। তবে তার মুখের মধ্যে যা রয়েছে তা বের করে ফেলা ওয়াজিব।

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ

ইসলামের স্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে, জীবনে একবার বাইতিল্লাহহিল হারামে (আল্লাহর পবিত্র ঘরের) হজ্জ আদায় করা। একাধিকবার হজ্জ আদায় নফল বলে গণ্য। হজ্জের অসংখ্যা উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত: এটি হচ্ছে একযোগে আত্মা শরীর ও মালের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেক দেশ ও স্থান থেকে মুসলিমগণ এক স্থানে সমবেত হয়ে থাকেন, তারা এক স্থানে একত্রিত হন, একই ধরনের বস্ত্র পরিধান করেন, একই রবের ইবাদাত করার সুযোগ লাভ করেন। শাসক ও শাসিত, ধনী ও গরীব, সাদা ও কালো একই আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দা হওয়ার কারণে এক হয়ে হজ্জ পালনের মাধমে পারস্পরিক জানা ও সহযোগিতার পথ প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে তাদের সকলকে আল্লাহ পুনরুত্থান করবেন, তারা তা স্মরণ করেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

কা'বা (মুসলিমদের কিবলা) যেখানেই থাকুক না কেন যার দিকে ফিরে আল্লাহ প্রতিটি ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই কা'বার চতুর্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ এবং মক্কার অন্যান্য জায়গায় যেমন আরাফাত ও মুযদালিফায় এবং মিনায় নির্ধারিত সময়ে অবস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সমস্ত পবিত্র স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করা, যে

অবস্থা ও ধরনের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সে অবস্থায় তা আদায় করা।

স্বয়ং ক্বা‘বা, ঐ সমস্ত জায়গা এবং অন্য কোনো সৃষ্টকে কখনো ইবাদাত করা যায় না, এরা কারো কোনো ভাল মন্দ করতে পারে না, বরং ইবাদাত কেবল আল্লাহরই অধিকার। ভালো-মন্দ করার এখতিয়ার আল্লাহরই হাতে। যদি আল্লাহ তার ঘরের হজ্জ করার নির্দেশ না দিতেন, তাহলে সেখানে মুসলিমের হজ্জ করা ঠিক হত না। কেননা, ইবাদত কারো মতামত ও ইচ্ছার ভিত্তিতে হয় না, বরং এটি আল্লাহর কিতাবে তাঁর নির্দেশ অথবা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নতের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা সেই সমস্ত লোকদের উপর (ফরয) যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ রাখে। আর যে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।”[১৫] (আলে ইমরান: ৯৭)

---

15 অপরদিকে ওলীদের কবর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানে মুর্খদের হজ্জ পালন গুমরাহী, যা আল্লাহর নির্দেশ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশের পরিপন্থি। ‘‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- ‘‘(ছাওয়াবের নিয়তে) তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোথায় ভ্রমনের

হজ্জের সময় হোক বা অন্য সময় হোক উমরাহ, প্রতি মুসলিমের উপর জীবনে একবার ওয়াজিব। মদীনায় অবস্থিত মসজিদের নববীর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। যে করবে তাকে ছাওয়াব দেওয়া হবে, আর যে করবে না তাকে সাজা দেওয়া হবে না। তবে জানা দরকার যে, “যে হজ্জ করল অথচ আমার জিয়ারত করল না সে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করল” এ হাদীস ছহীহ নয়। এর দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর মিথ্যা চাপানো হয়েছে।[১৬]

শরী‘আত যেসব স্থনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে অনুমোদন করে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মসজিদে (নববী)। সুতরাং যখন য়িয়ারতকারী মসজিদে নববীতে পৌঁছে তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছালাত আদায় করবে; তখন তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করা শরীয়ত অনুমোদন করেছে। সুতরাং তিনি যিয়ারতের সময় বলবেন-

‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ’ (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক) এটি অত্যন্ত আদবের সাথে স্বর নিচু করে বলতে হবে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট কিছু

বাহন সাজাবে না; মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকছা।”

[16] ..এমনি হাদীস “ আমার মর্যাদাকে ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ কর কেননা আমার মর্যাদা আল্লাহর নিকট প্রমস্থ।” তেমনি হাদীস “যে পাথরের উপরে ভাল ধারণা রাখে সে তার উপকারে আসে।” এরূপ সকল হাদীসই বানানো হাদীস। যার কোনো সত্যতা নেই। কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থে এগুলো পাওয়া যায় না। বরং এগুলো ও এর সমমানের হাদীস সমূহ পথভ্রষ্ট এবং কোনো কিছু উপলব্ধি ছাড়াই শিরক ও বিদায়াতের দিকে আহবানকারী আলিমগণের বইসমূহে পাওয়া যায়।

চাওয়া যাবে না। বরং সালাম দিবেন এবং ফেরত চলে যাবেন। তিনি উম্মতকে তেমনটি করতেই শিখিয়েছেন। আর এটাই ছিল ছাহাবীগণের কাজ।

পক্ষান্তরে যারা ছালাতে দাঁড়ানোর মত বিনয় অবনত চিত্তে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কবরের সামনে দাঁড়ায়, তার নিকটে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা করে, তার কাছে বিপদ মুক্তি চায়, আল্লাহর কাছে তাঁকে মাধ্যম বানায়; তারা আল্লাহর সাথে শির্ককারী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের উচিত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কারো সাথে এরূপ কিছু করা থেকে সাবধান থাকা।

অতঃপর দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার কবর যিয়ারত শরী'আতসম্মত নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করবেন। আর তা হচ্ছে, যিয়ারতকারী মৃতের উপরে সালাম পাঠ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। মৃত্যুকে স্মরণ করবেন এবং এরপর প্রস্থান করবেন।

হজ্জ এবং ওমরায় করণীয় বিষয়াদি:

প্রথমত: হাজ্জী সাহেব পবিত্র ও হালাল খরচাদি সংগ্রহ করবেন। মুসলিম সকল অবস্থার মত হজ্জে সর্বদাই হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবেন। কেননা হারাম খরচাদি হজ্জকে হজ্জ সম্পাদনকারীর

দিকে ও দো‘আকে দো‘আকারীর দিকে ফিরিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে,

«كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»

“যে গোশত হারাম খেয়ে উৎপন্ন হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামই সবচেয়ে উত্তম স্থান।”

হাজী সাহেব ঈমানদার তাওহীদ পন্থী ও সৎ সংগীদের সাথী হবেন।

মীক্বাতসমূহ:

গাড়ী বা অনুরূপ কিছুতে থাকলে মীকাতে পৌঁছলে সেখান হতে ইহরাম বাঁধবেন। আর যখন বিমানে থাকে তখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছলে তা অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মীক্বাতগুলো থেকে মানুষদেরকে ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে:

১. মদীনা বাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, (আবয়ারে আলী)

২. সিরিয়া, মিশর ও মরক্কোর অধিবাসীদের জন্য জুহফাহ (রাবেগের নিকটবর্তী,

৩. নাজদ এবং তায়েফবাসী ও তাদের দিক থেকে আগতদের জন্য কারনুল মানাযিল (আস-সাইল অথবা মাহরাম উপত্যাকা)

৪. ইরাকবাসীদের জন্য যাতু ইরক

৫. ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম।

যাদের জন্য এ সমস্ত স্থান নির্ধারিত, তারা ব্যতীত অন্যরাও যারা এ পথে আসবেন তাদের সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। মক্কার অধিবাসীগণ (হজ্জের জন্য) ও মীকাতের অভ্যন্তর ভাগের লোকগণ (হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য) নিজেদের ঘর হতেই ইহরাম বাঁধবেন।

ইহরামের জন্য করণীয়

ইহরামের পূর্বে পরিষ্কার হওয়া পবিত্র, হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। অতঃপর মীকাতে গিয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। বিমানের যাত্রী নিজের দেশ হতেই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। অতঃপর যখন মীকাতের নিকটবর্তী হবেন তখন নিয়ত বেঁধে নিবেন ও তালবীয়াহ পাঠ করবেন। পুরুষের ইহরামের কাপড় হচ্ছে সেলাইবিহীন একটি চাদর ও একটি লুংগি। শরীর এ দু'টি দিয়ে ঢাকবেন তবে নিজের মাথা ঢাকবেন না। অপরদিকে মহিলাগণের ইহরামের জন্য নির্ধারিত কোনো পোষাক নেই। তবে তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রশস্ত কাপড় যা দ্বারা আবৃত হওয়ার পর কেউ দেখলেও

ফিতনামুক্ত থাকে; তা পরিধান ওয়াজিব। ইহরামের সময় তাদের চেহারা ও দুহাতের উপরে সেলাইকৃত কিছু যেমন সেলাই করা মুখের পর্দা ও হাত মোজা পরিধান বৈধ নয়। অবশ্য যখন তারা কোনো পুরুষদেরকে দেখবেন তারা মাথার উপরে রাখা উড়না দিয়ে উম্মাহাতুল মুমেনীন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিলা ছাহাবীদের মত সমগ্র মুখমণ্ডল আবৃত করবেন।

অতঃপর যখন হাজ্জী সাহেব ইহরাম বাঁধবেন, মনে মনে ওমরার নিয়ত করবেন। এরপর এ বলে তালবীয়াহ পাঠ করবেন যে, 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান' "হে আল্লাহ ওমরা অবস্থায় আমি আপনার সকাশে উপস্থিত।" আর এ উমরা দ্বারা তামাত্তু হজ্বের কর্মকাণ্ডে উপনীত হবে। বস্তুত এ তামাত্তুই উত্তম প্রকার হজ্জ। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ছাহাবীদের (রা) এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বাধ্য করেছিলেন। এমনকি যারা তাঁর এও নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পিছপা হচ্ছিলেন, তাদের প্রতি তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন। তবে যাদের সাথে হাদির পশু থাকবে তারা ক্বিরান অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মত ইহরাম না খুলে অপেক্ষা করবেন। **ক্বিরানকারী** (ওমরা ও হজ্জ এক ইহরামে পালনকারী) তাকে বলা হয়, যিনি তাঁর তালবীয়াতে বলবেন- "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়াহাজ্জান"। (হে আল্লাহ আপনার কাছে উমরা ও হজ্জ অবস্থায় উপস্থিত হয়েছি।) কুরবানীর দিন কুরবানীর পশু জবেহ করা ব্যতীত তিনি তার ইহরাম পরিত্যাগ করবেন না। আর মুফরিদ হজ্জকারী হিসেবে তিনিই

বিবেচিত হবেন যিনি ইহরামের নিয়ত বাঁধার সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করবেন এবং বলবেন, ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান’ (হে আল্লাহ, আমি হজ্জে উপনীত হয়ে আপনার দরবারে হাজীর)।

মুহরিমের উপর যা যা হারাম:

মুহরিম তথা ইহরাম বাঁধার পর যে সব বস্তু হারাম হয়ে যায়, তা হচ্ছে:

১. সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন চুমু, যৌন উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ, যৌন কথাবার্তা, বিয়ের প্রস্তাব দান, বিয়ে পড়ানো। ইহরামকারী নিজের বিয়ে করতে পারবেন না, অন্যকে বিয়ে করাতেও পারবে না।

২. চুল মুণ্ডন করা বা তা থেকে কিছু অংশ কাটা।

৩. নখ কাটা।

৪. মাথায় লেগে থাকা এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা। তবে ছাতা, তাঁবু ও গাড়ি দ্বারা ছায়া লাভ নিষিদ্ধ নয়।

৫. সুগন্ধি মাখা ও সুগন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া।

৬.স্থলজ প্রাণী শিকার করা। সুতরাং তিনি নিজে শিকার করবেন না, কাউকে শিকার দেখিয়েও দিবেন না।

৭.পুরুষেরা সেলাইকৃত পোষাক এবং মহিলারা মুখে ও দুহাতে সেলাইকৃত কিছু পরিধান করবেন না। পুরুষেরা স্যান্ডেল পরবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মোজা পরতে পারেন।

অতঃপর যখন ইহরামকারী কা'বাতে পৌঁছাবেন তখন 'হাজরে আসওয়াদ' থেকে শুরু করে তাওয়াফে কুদুমের সাত চক্রের মাধ্যমে তা প্রদক্ষিণ করবেন। এটা হচ্ছে তার উমরার তাওয়াফ। তাওয়াফের জন্য কোনো দো'আ নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহর যিকির করবেন এবং যা আপনার জন্য সহজ হয়, সেই দো'আ করবেন।[১৭] অতঃপর সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে অন্যথায় হারামের যে কোনো জায়গায় দুই রাক'আত তাওয়াফের ছালাত আদায় করবেন। এরপর সা'ঈর জায়গার দিকে যাবেন এবং ছাফা থেকে (সা'ঈ) শুরু করবেন।

সাফার উপরে উঠবেন, কেবলামুখী হবেন। তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়বেন, দো'আ করবেন। অতঃপর মারওয়ার দিকে সা'ঈ করবেন। এরপর মারওয়াতে আরোহন করবেন। কিবলামুখী হবেন। তাকবীর বলবেন। আল্লাহর যিকির করবেন। দো'আ করবেন। এরপর সাফার দিকে

---

[17] তবে দুই রুকনের মাঝখানে হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তাই বলবেন। তা হচ্ছে,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

“হে আমাদের রব! দুনিয়ায় আমাদের মঙ্গল ও আখিরাতে আমাদের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।” [সূরা আল-বাকারাহ: ২০১]

প্রত্যাবর্তন করবেন। এভাবে যাওয়াকে একবার এবং আসাকে আর একবার ধরে সাতবার সা'ঈ পূর্ণ করবেন। পরে মাথার চুল ছোট করবেন। মহিলারা চুলের পার্শ্ব হতে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ ছোট করবেন। এর মধ্যে দিয়ে তামাত্তু হাজী সাহেবের ওমরাহ সম্পন্ন হল ও ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন। ইহরামের কারণে তার উপরে যা হারাম ছিল, তা হালাল হয়ে গেল। যদি মহিলা ইহরাম বাঁধার পূর্বে বা পরে হায়েযগ্রস্তা হন বা বাচ্চা প্রসব করেন তাহলে তিনি ক্বারীন হাজী বলে গণ্য হবেন এবং অন্যান্য হাজীদের মত ইহরাম বাঁধার পরে ওমরাহ ও হজ্জের তালবীয়াহ পড়বেন। কেননা হায়েয ও নিফাস ইহরাম বাঁধা বা মাশায়েরে (মিনা, আরাফাহতে) অবস্থানকে নিষিদ্ধ করে না। শুধুমাত্র তাওয়াফ করা হতে নিষিদ্ধ করে। সুতরাং তিনি তাওয়াফ ব্যতীত সমগ্র হাজীগণ যা করেন তাই করবেন এবং তাওয়াফ করার জন্য তিনি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যদি মানুষদের হজ্জের ইহরাম বাঁধা ও মিনার দিকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি পবিত্রতা অর্জন করেন, তাহলে গোসল করবেন। তাওয়াফ করবেন, সা'ঈ করবেন, চুল ছোট করবেন এবং ওমরার ইহরাম হতে হালাল হবেন। পরে অষ্টম তারিখে যখন মানুষেরা হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তিনিও তাদের সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। যদি তার পবিত্রতা অর্জনের পূর্বেই মানুষেরা হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তাহলে তিনি ক্বারিন হাজী হিসাবে তাদের সাথে ইহরাম অবস্থায় তালবিয়াহ পড়বেন এবং অন্যান্যদের মত মিনাতে যাওয়া, আরাফাতে ও মুযদালিফাতে অবস্থান, পাথর

নিক্ষেপ (রমী করা), হাদি যবাই করা, ঈদের দিনে চুল ছোট করা সব কিছুই করবেন। অতঃপর যখন তিনি পবিত্র হবেন, গোসল করবেন, হজ্জের তাওয়াফ ও সা‘ঈ করবেন। এ তাওয়াফ ও সা‘ঈই তার ওমরাহ ও হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনটি হয়েছিল উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) এর জন্য। নবী (আ) তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যখন সে মানুষদের সাথে তাওয়াফে ইফাদ্বাহ করেছে, তখন পবিত্রতা অর্জনের পরে তার তাওয়াফ ও সা‘ঈ হজ্জ ও ওমরাহর জন্য যথেষ্ট। কেননা কিরান হাজ্জীর জন্য শুধুমাত্র এক তাওয়াফ ও এক সা‘ঈ করতে হয়, যেমনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুমোদন দিয়েছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত তাঁর কাজ ও কথা এ কথারই সমর্থন দেয়। তিনি বলেন, “কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে ওমরাহ প্রবেশ করেছে।” আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অতঃপর যখন জুলহাজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ আসবে, হাজ্জী সাহেবান তাদের মক্কায় অবস্থানের স্থান হতে হতে মীকাতে যেভাবে ইহরাম বেঁধেছিলেন সেভাবে ইহরাম বাঁধবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবেন, এরপর ইহরামের কাপড় পরবেন এবং হাজ্জী পুরুষ হউক বা মহিলা; হজ্জের নিয়ত করবেন এবং এ বলে তালবীয়াহ পড়তে থাকবেন, “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান” (হে আল্লাহ, আমি হজ্জের অবস্থায় আপনার সামনে উপস্থিত।) এরপর কুরবানীর দিন মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে ‘আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে পুরুষরা মাথা ও মহিলাদের চুল না ছাটা পর্যন্ত পূর্বে বর্ণিত ইহরামের অবস্থায় অবৈধ সকল কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে।

যখন হাজ্জী সাহেব অষ্টম তারিখে ইহরাম বাঁধবেন, তখন সকল হাজ্জী সাহেবদের সাথে মিনায় যাবেন। সেখানে রাত্রি যাপন করবেন এবং প্রতি ওয়াক্তের ছালাত নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত না করে কছরের সাথে আদায় করবেন। অতঃপর আরাফার দিন সূর্য উঠলে হাজ্জীদের সাথে নামিরাহ এর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। অতঃপর সেখানে ইমামের সাথে অথবা যেখানে তিনি আছেন সেখানে জমাতের সাথে যোহর ও আছরের ছালাত একত্রে কসর করে আদায় করবেন। অতঃপর সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে আরাফার দিকে রওয়ানা দিবেন। তবে যদি কেউ মিনা থেকে সরাসরি আরাফার মাঠের দিকে রওয়ানা দিয়ে আরাফার মাঠেই অবস্থান করেন সেটাও জায়েয হবে। আর আরাফার সমস্ত জায়াগায়ই অবস্থানের স্থান।

আরাফাতে হাজ্জীগণ বেশি বেশি আল্লাহর যিকর দো‘আ ও গোনাহ ক্ষমা চাইতে থাকবেন। এ সময় কিবলাহমুখী হবেন, পাহাড়মুখী নয়। কেননা পাহাড় আরাফাতের অংশ ব্যতীত কিছু নয়। ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেখানে আরোহণও ঠিক নয়। এর পাথর স্পর্শ করা (বরকতের জন্য) জায়েয নয়। কেননা এটি হারাম ও বিদ‘আত।

সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত হাজী সাহেবগণ মুদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন না। তারপর যখন সূর্য ডুবে যাবে তখন তারা মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করবেন। যখন সেখানে পৌঁছে যাবেন তখন মাগরিব ও ‘ইশার ছালাত একত্রে পড়বেন। ‘ইশাকে কছর করবেন। সেখানে রাত্র অতিবাহিত করবেন। যখন প্রভাত হবে ফজরের ছালাত আদায়

করবেন। আল্লাহর যিকর করবেন, অতঃপর মিনার দিকে সূর্য উদয়ের পূর্বে রওয়ানা দিবেন, যখন মিনাতে পৌঁছবেন, সূর্য উদয়ের পরে জামরাতুল ‘আকাবাতে বুটের আকারের চেয়ে ছোটও নয় বড়ও নয়, এমনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। সেখানে স্যান্ডেল নিক্ষেপ জায়েয নয়। কেননা এ রকম খেলা করতে শয়তান উদ্বুদ্ধ করে। শয়তানের অপমান তো তখনই হবে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশনা ও তারা রাস্তা অনুসরণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা হবে। (জুতা নিক্ষেপের মাধ্যমে নয়)

অতঃপর পুরুষ চুল মুণ্ডন করবেন এবং মহিলারা চুল ছোট করবেন। পুরুষরা যদি চুল ছাটেন, তবে তাও জায়েয হবে, কিন্তু চুল মুণ্ডন করা তিনগুণ উত্তম। অতঃপর নিজস্ব কাপড় পরিধান করবেন এবং এ সময় তার জন্য ইহরামের কারণে যা যা হারাম ছিল শুধুমাত্র স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবই হালাল হয়ে গেল। অতঃপর মক্কায় গিয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পন্ন করবেন। এর মাধ্যমে সকল কিছু এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত তার জন্য হালাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মিনাতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ঈদের দিন ও পরের দুইদিনের রাতসহ সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে রাত যাপন করবেন। একাদশ ও দ্বাদশ দিনে তিনটি জামরাতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে পাথর নিক্ষেপ করবেন। ছোট জামরাহ, যেটি মিনার সাথেই অবস্থিত, সেখান থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু করবেন। তারপর মধ্যমাটি তারপর বড়টিতে পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকটিতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ

করতে হবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন। নিক্ষেপের পাথরসমূহ মিনায় অবস্থানের জায়গা হতে সংগ্রহ করবেন। যদি কেউ মিনায় জায়গা না পান তবে তাঁবু যেখানে তাকে রেখেছে সেখানে তিনি অবস্থান করবেন।

অতঃপর যদি কেউ দ্বাদশ দিনে পাথর নিক্ষেপ করে পরে মিনা পরিত্যাগ করতে চান; করতে পারেন। যদি ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত কেউ অপেক্ষা করেন তাহলে তা উত্তম। এদিনেও সূর্য ঢলে যাওয়ার পরেই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। যদি তিনি সফরের ইচ্ছা করেন, কা'বায় তাওয়াফে ওদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। এর পরেই তাড়াতাড়ি সফর করবেন। হায়েয ও নিফাসগ্রস্তা মহিলা যদি হজ্জের তাওয়াফ ও সা'ঈ করে থাকেন তাহলে তার জন্য তাওয়াফে ওদা' না করলেও চলবে।

যদি হাজ্জী সাহেব তার কুরবানীর পশু একাদশ কিংবা দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত যবেহ করতে অপেক্ষা করেন, তবে তা জায়িয হব। যদি কেউ হজ্জের তাওয়াফ ও সা'ঈ করতে সর্বশেষ মিনা ছেড়ে আসা পর্যন্তও দেরী করেন, তবে তাও তার জন্য বৈধ হবে। অবশ্য যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেটাই উত্তম। আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর হে আল্লাহ, দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

ঈমানের বিবরণ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ও ইসলামের স্তম্ভসমূহের উপরে ঈমান আনার পাশাপাশি তার ফিরিশতা[১৮] ও তাঁর রাসূলগণের উপরে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের[১৯] উপর ঈমান আনা ফরয করেছেন, যে কিতাবসমূহের শেষ কিতাব ছিল কুরআন, যা দিয়ে আল্লাহ অন্যান্য সব কিছুকে রহিত করেছেন, যাকে অন্যান্য কিতাবের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপনের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। আরও ফরয করেছেন আল্লাহর রাসূলগণের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সকলের প্রতি ঈমান আনা। কেননা তাদের রিসালাত হচ্ছে এক। তাদের দ্বীন হচ্ছে এক, আর

---

[18] ফিরিশতা: ঐ সমস্ত আত্মা [ও দেহ], যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা [সৃষ্ট] নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। তারা অসংখ্য। আল্লাহ ব্যতীত তাদের কেউ গণনা করতে পারে না। তাদের কেউ কেউ আসমানে অবস্থান করছেন, কেউ কেউ আদম সন্তানদের তত্ত্বাবধান করছেন।

[19] অর্থা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের উপরে যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য। তন্মধ্যে শুধু কুরআন ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। অপরদিকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের হাতে যা বিদ্যমান তা তাদেরই রচিত; কারণ তা মতভেদপূর্ণ এবং সেখানে তাদের উক্তি "ইলাহ তিনজন" "ঈসা আল্লাহর পুত্র"। কেননা নিশ্চয় ইলাহ এক, তিনি হলেন আল্লাহ এবং ঈসা নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। যেমন কুরআনে এসেছে। সেখানে আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ হয়েছে যে, কুরআন সকল কিছুকেই রহিত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ওমর (রা) এর হাতে তাওরাতের একটি পৃষ্ঠা দেখে রাগান্বিত হন এবং বলেন, হে খাত্তাব পুত্র, তুমি কি সন্দেহে রয়েছ? আল্লাহর শপথ যদি আমার ভাই মুসা জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কিছু করার চেষ্টা করতেন না। তখন ওমর পৃষ্ঠাটি ছুঁড়ে ফেললেন ও বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

তা হচ্ছে ইসলাম। তাদের প্রেরণকারীও এক। তিনি হচ্ছেন বিশ্বজগতের রব্ব। সুতরাং মুসলিমের ঈমান আনা উচিত যে, কুরআনে আল্লাহ যে সমস্ত রাসূলদের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা পূর্ববর্তী উম্মতের কাছে আল্লাহর পাঠানো রাসূল ছিলেন। আরো ঈমান আনতে হবে যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর শেষ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাকে বিশ্বের সমগ্র মানুষের নিকট পাঠানো হয়েছে। তাঁকে পাঠানোর পরে সকল মানুষই এমনকি ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও তাঁর উম্মত। কেননা মাটির উপরে সকল মানুষই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত এবং তার অনুসরণ তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরসণ করে না এবং ইসলামে প্রবেশ করে না তাদের সাথে মূসা (আ) ও ঈসা (আ) ও অন্যান্য রাসূলগণের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা মুসলিম মাত্রই সকল রাসূলের উপর ঈমান আনে, তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করে। তাই যে কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনবে না, তাঁকে অনুসরণ করবে না, দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করবে না, সে সকল রাসূলকে অস্বীকার করল, তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, যদিও সে তাদের কোনো একজনের উপর ঈমান আনার দাবীদার হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আল্লাহর কালাম থেকে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাদীসে বলেন-

«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار»

“যার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ, এ উম্মতের মধ্যে ইয়াহূদী হোক বা খৃষ্টান হোক যে আমার সম্পর্কে শুনল অতঃপর আমি যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি তার উপরে ঈমান আনল না, সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে।” (সহীহ মুসলিম)

অনুরূপভাবে আরও ঈমান আনা ওয়াজিব হচ্ছে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব কিতাব, প্রতিফল প্রাপ্তি, জান্নাত ও জাহান্নামের উপর। তদ্রূপ আরও ওয়াজিব হচ্ছে তাকদীরের উপর ঈমান আনয়ন করা।

আর তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মুসলিম এ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করবেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল কিছু জানেন। তিনি বান্দার কর্ম সম্পর্কে আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বেই জানেন। এ জানা জিনিসকে তিনি তার নিকট লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। মুসলিম এটিও জানবেন যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়। যা চান না, তা হয় না। আর এটাও বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদেরকে তাঁরই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর আনুগত্য কি তাদেরকে তাও বর্ণনা করেছেন। আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং গুনাহের কাজ কি তাও বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদেরকে এ সামর্থ্য

ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন যে, তারা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ করে সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে। অনুরূপভাবে আল্লাহর নিষেধকৃত কাজকে আঞ্জাম দিয়ে শাস্তির অধিকারীও হতে পারে।

তবে বান্দাদের এ ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিরই আওতাধীন। অপরদিকে যে সমস্ত কাজ করতে আল্লাহ বান্দাহদেরকে ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার দেন নি, তার পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের থেকে এ কাজ হয়ে থাকে যেমন ভুল করে কিছু করা, কোনো কিছু করতে ভুলে যাওয়া, কোনো কিছু করতে বাধ্য করা, যেমন দারিদ্রতা, রোগ বালামুছিবত প্রভৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন না এবং সাজাও দিবেন না, বরং বালা-মুছিবত দারিদ্রতা ও রোগে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীরের উপর খুশী থেকে ধৈর্য ধারণ করলে, বড় পুরস্কার দান করবেন। এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হল এর প্রতিটির উপর ঈমান আনা মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

আর মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় ঈমানদার, তাঁর সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক ও জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে আল্লাহর মুহসিন বান্দাগণ। যারা যারা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন, তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন, যেন তারা তাঁকে দেখছেন। আর তারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানী করেন না। তারা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, যেখানেই তারা থাকুন না কেন তিনি তাদেরকে দেখেন। তাদের কাজ, কথা ও নিয়ত থেকে কিছুই তার কাছে অপ্রকাশ্য থাকে না।

তাই তারা তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করেন, তাঁর নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করেন। যখন তাদের কেউ আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে পাপে লিপ্ত হয়, তা থেকে আল্লাহর কাছে তাড়াতাড়ি সত্য সঠিক তওবাহ করেন এবং কৃত গোনাহের কারণে লজ্জিত হন। আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চান ও ঐ কাজ পুনরাবৃত্তি করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨ ﴾ [النحل: ١٢٨]

"যারা তাকওয়া অর্জন করেছে ও সৎকর্মশীল, (মুহসিন) আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।" (জ্ঞানে এবং সাহায্য-সহযোগিতায়) (সূরা নাহল-১২৮)

ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন-

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]

"আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমি আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ্-৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٩ ﴾ [الاسراء: ٩]

"নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় পথের দিকে এ কুরআন পথ নির্দেশ করে এবং যে সমস্ত মুমিনরা সৎ কাজ করে, তাদেরকে এ সসংবাদ দেয় যে, নিশ্চয় তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।" (বনী ইসরাঈল-৯)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]

“এবং আমি তোমাদের উপর ঐ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে সকল কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ নিহিত রয়েছে।” (সূরা আন-নাহল-৮৯)

বিশুদ্ধ হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك".

“আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার দলিল ও প্রমাণাদির উপরে ছেড়ে দিলাম। যার রাত দিন সমান। তার থেকে যে ভিন্নমুখী হবে, সেই ধ্বংস হবে।”

অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন,

"تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنتي"

“তোমাদের মধ্যে আমি যা রেখে গেলাম যদি তোমরা তাকে ধরে থাক, কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।”

পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় তিনি মুসলিমদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনো কমতি নেই এবং এটিতে কখনো কোনো কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। প্রতিটি সময়ে প্রতিটি জায়গায় ও প্রত্যেক উম্মতের জন্য এটি উপযোগী। তিনি

বলেছেন যে, পরিপূর্ণ ক্ষমাসুন্দর এ মহান জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের জন্য প্রণয়ন করে ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাতকে পাঠিয়ে, ইসলামকে বিজয়ী করে এবং তা অবলম্বনকারীদেরকে তাদের শত্রুদের উপরে সাহায্য করে, তিনি তার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন। আরো বলেছেন, তিনি ইসলামকে মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলে এ দীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) তিনি কখনো অপছন্দ করবেন না। এ জীবন ব্যবস্থা ব্যতীত কখনো কারো থেকে কিছুই তিনি গ্রহণ করবেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন যে, নিশ্চয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, এখানে ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সত্যিকারের সকল সমাধান বর্ণিত হয়েছে। এর উপরে চলা ব্যতীত কোনো মঙ্গল নেই। এটি বর্জনের মধ্যেই সকল অমঙ্গল নিহিত। প্রতিটি সমস্যা, চাই পুরাতন হোক, বর্তমান হোক অথবা ভবিষ্যতের হোক, এর ইনছাফ ভিত্তিক; সঠিক সমাধান কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। যে সমাধান কুরআন পরিপন্থী তা মুর্খতা ও যুলম; সুতরাং জ্ঞান, আকীদাহ, রাজনীতি, রাষ্ট্র-বিচার-পদ্ধতি, মানসিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক জ্ঞান, শাস্তির পদ্ধতি প্রভৃতি যা কিছুরই মানুষ প্রয়োজন অনুভব করুক না কেন; পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভাষায় তিনি তা পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

﴿ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: ٨٩]

“কুরআন প্রতিটি জিনিষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে।” পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে পরিষ্কার করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা, তার মজবুতি ও সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের জীবন পদ্ধতি

১. জ্ঞান অর্জন:

মানুষের প্রথম ওয়াজিব সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, জ্ঞান অর্জন কর। যেমন আল্লাহ বলেন-

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ١٩ ﴾ [محمد: ١٩]

"অতঃপর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো হক্ক ইলাহ (উপাস্য) নেই। তোমার ও মুমিন পুরুষ এবং মুমিনাহ মহিলাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাও; আর আল্লাহ জানেন তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান। [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

আল্লাহ আরও বলেন-

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ ﴾ [المجادلة: ١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদরে মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ-১১)

আল্লাহ আরও বলেন-

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ﴾ [طه: ١١٤]

“তুমি বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।” (সূরা ত্বহা-১১৪)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]

“অতঃপর তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।” (সূরা আন-নাহল-৪৩) আর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহীহ হাদীছে বলেছেন-

«طلب العلم فريضة على كل مسلم»

”জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।”

তিনি আরও বলেন-

«فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»

“একজন মূর্খের উপরে জ্ঞানীর মর্যাদা তেমনি যেমন পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের উপর।”

ইসলামে অত্যাবশ্যকীয়তার দিক থেকে জ্ঞানকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ: প্রতিটি মুসলিম পুরুষ হোক মহিলা হোক, এটি অর্জন করা ফরয, কোনো ওজন আপত্তি দেখিয়ে এথেকে কেউ মূর্খ থাকতে পারে না। এটি হচ্ছে দলীল ও প্রমাণ সহকারে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান।

দ্বিতীয় ভাগ: জ্ঞান অর্জনের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, ফরযে কিফায়াহ। এ বিষয়ে যখন যথেষ্ট সংখ্যক লোক জ্ঞান অর্জন করে, তখন অন্যদের এ জ্ঞান অর্জন না করলেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখন এটি বিশিষ্ট লোকদের জন্য ওয়াজিব না হয়ে, মুস্তাহাব বলে গণ্য হয়। এটি ইসলামী শরী'আতের ঐ জ্ঞান যা মানুষকে বিচার করা ও ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্যতা দান করে। তেমনি শিল্প ও জীবন ধারণের জন্য মুসলিমেরা যে প্রয়োজন অনুভব করে, এমনি প্রয়োজনীয় পেশা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে মুসলিমদের শাসক এ ধরনের জ্ঞান অর্জনকে অত্যাবশ্যকীয় করে দিবেন।

২. আকীদা বিশ্বাস:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন ঘোষণা দেন যে, সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা। তাঁরই ইবাদাত করা সকলের উপরে ওয়াজিব এবং তাঁর এ ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারা যেন যে

কোনো মাধ্যম বাদ দিয়েই সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলে। যার বর্ণনা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এর অর্থে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, একক আল্লাহর উপরে ভরসা করতে, তাকে ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় না করতে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করতে। কেননা তিনিই একমাত্র ভাল-মন্দ করতে পারেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে ঐ গুণে পরিপূর্ণ গুণান্বিত করতে, যে গুণে নিজেকে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন। যেমন এর বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

৩. মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়া:

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমকে সৎ হওয়ার ও মানব জাতিকে কুফরীর অন্ধকার হতে বাঁচিয়ে ইসলামের জ্যোতির মধ্যে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য আমি আমার প্রতি অর্পিত ওয়াজিবের কিছু অংশ পালনের জন্য এ পুস্তক রচনা করেছি ও প্রকাশ করেছি।

একজন মুসলিম অপরের সাথে যে সম্পর্ক গড়বে তা হবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সম্পর্কে। এ নির্দেশও আল্লাহ দিয়েছেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর সৎ বান্দাহ ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত বান্দাদের ভালবাসবেন, যদিও তারা অনেক দূরের হোক না কেন এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননাকারীদের উপরে তিনি অসন্তুষ্ট থাকবেন, যদিও তারা নিকটের হোক না কেন। ঈমানের এ সম্পর্কে ঐ

সম্পর্ক, যা সকল বিচ্ছিন্ন ও মতভেদকারীদেরকে এক করে দেয়; পক্ষান্তরে বংশ, দেশ ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠা ঐক্য, কেননা তা খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

"তুমি এমন কোনো কওমকে পাবে না, যারা আল্লাহর উপর ও শেষ দিনের উপরে ঈমান রেখে তাদের পিতৃপুরুষ অথবা সন্তান-সন্ততি অথবা ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা গোত্রগোষ্ঠীকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও তাকে ভালবাসে।" (সূরা আল-মুজাদালাহ্: ২২)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেছেন-

﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴾ [الحجرات: ١٣]

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মনিত যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়া অর্জন করেছে।" (সূরা আল-হুজুরাত-১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা প্রথম আয়াতটিতে জানিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কখনো নিকটতম হলেও আল্লাহর শত্রুদের ভালবাসেন না। দ্বিতীয়টিতে বলেছেন, যে কোনো রং ও যে

কোনো জাতিরই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত ও সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সে-ই, যে তাঁর অনুগত।

আল্লাহ তা'আলা শত্রু ও বন্ধু সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যুলুমকে নিজের উপর হারাম ঘোষণা করেছেন আর তার বান্দাদের মাঝেও তা হারাম করেছেন। আমানত রক্ষা করা ও সত্য বলার নির্দেশ দিয়েছেন। খিয়ানত করাকে হারাম করেছেন। মাতা-পিতার প্রতি সদয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, সকল কিছু; এমনকি পশুর প্রতিও ভাল ব্যবহার নির্দেশ দিয়েছেন। এদেরকে শাস্তি দিতে নিষেধ এবং এদের প্রতি করুণা করার হুকুম দিয়েছেন[20]। তবে ক্ষতিকারণ প্রাণী যেমন হিংস্র কুকুর, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, গিরগিটিকে, এদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মারা যাবে, তবে শাস্তি দিয়ে নয়।

৪. মুমিনের জন্য আত্মপর্যালোচনা ও উপদেশ গ্রহণঃ

মহাগ্রস্থ কুরআনের আয়াতে মানুষদেরকে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় যেখানে তারা থাকে না কেন, আল্লাহ তাদেরকে দেখেন। তিনি তাদের সকল কর্ম সম্পর্কে জানেন। তাদের নিয়ত সম্পর্কে জানেন।

---

[20] এমন কি হালাল পশু জবহ করার সময়ও যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছুরিকে তীক্ষ্ণ ও জবেহকৃত পশুকে আরাম দানের নির্দেশ দিয়েছেন। জবেহের জায়গা গলা, শ্বাসনালী ও রক্ত প্রবাহের শিরা কেটে দিতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। উটের হাঁটুর নিচে সিনাতে আঘাত করে নহর করতে হয়। পশুকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া বা মাথায় মারা প্রভৃতি হারাম। এটা খাওয়া জায়িয নয়।

তিনি তাদের কাজ ও কথা গণনার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ফিরিশতারা তাদের সাথেই আছেন। তাদের থেকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যাই করা হয়, তারা তা লেখেন, তাঁরা যা করছে ও বলছে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার হিসাব কিতাব নেওয়া হবে। এ জীবনে তার নাফরমানী করলে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে, তাদেরকে কঠোর আযাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহর উপরে ঈমান স্থাপনকারীদের জন্য এটাই বড় ধমক, যা তাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং তারা আল্লাহকে ভয় করে, অপরাধ ও তার বিরোধিতা বর্জন করবেন।

অপরদিকে যে আল্লাহকে ভয় করে না ও সুযোগ পেলেই পাপে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তার জন্য সাজার ব্যবস্থা করেছেন; যা তাদেরকেও এ অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুসলিমদের ভাল কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধের নির্দেশনা প্রদান। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম কাউকে কোনো পাপ কাজ করতে দেখলে তার অনুভূতিতে জেগে উঠবে যে অন্যরা যে অপরাধ করছে তার জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে। তাই সে হাত দিয়ে শাস্তি দিয়ে প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখলে মুখ দিয়ে নিষেধ করে হলেও সেটা প্রতিহত করবে।

আর আল্লাহ মুসলিম শাসকদেরকে অপরাধীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা (হুদুদ) কার্যকর করার নির্দেশ

দিয়েছেন। ‘হুদুদ’ হচ্ছে অপরাধের মান অনুযায়ী ঐ সমস্ত সাজা যা আল্লাহ তার কুরআনে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে অপরাধীদের উপরে কার্যকর করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন যাতে করে ইনসাফ, নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে বজায় থাকে।

৫. সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা:

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে পরস্পরের মধ্যে আর্থিক ও মানবিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি যাকাত ও ছদকার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যে কোনো প্রকারের কষ্টই হোক না কেন, এমনকি রাস্তা ও ছায়ায় পর্যন্তও কষ্টের কোনো কিছু রাখা আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের উপর হারাম করেছেন। যদিও এটা অন্যরা রেখে থাকে; এর পরও এটাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিরসনকারীর জন্য ছাওয়ার ও কষ্টদাতার জন্য শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে নিজের ভাইদের জন্যও তাই ভাল মনে করবে এবং নিজের জন্য যা খারাপ মনে করবে নিজের ভাইয়ের জন্যও তা খারাপ মনে করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন-

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾ [المائدة: ٢]

“এবং তোমরা পূর্ণও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পারস্পরে সহযোগিতা করবে না।” (সূরা মায়িদা-২)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ ﴾ [الحجرات: ١٠]

“নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজ কর।” (সূরা হুজরাত-১০)

আল্লাহ আরও বলেন-

﴿ ۞لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤ ﴾ [النساء: ١١٤]

“যারা দানখয়রাত অথবা সৎ কাজ অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তারা ব্যতীত তাদের অধিকাংশের পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একাজ করে, আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দান করবেন।” (সূরা নিসা-১১৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

“তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা পর্যন্ত মুমিন হবে না।’ (মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে বিদায় হজ্জে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় পূর্বে তিনি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আরো তাকীদ সহকারে বলেছেন যে,

«يا أيها الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا أبلغ رسول الله».

“হে মানব জাতি তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। হুঁশিয়ার, কোনো অনারবের উপরে আরবীয়ের, কোনো আরবীয়ের উপরে কোনো অনারবের, কোনো লাল রঙের মানুষের উপরে কালো মানুষের, কোনো কালো মানুষের উপর লাল মানুষের তাকওয়ার মানদন্ড ব্যতীত মর্যাদাতে কোনো পার্থক্য নেই। আমি কি এখন পৌঁছে দিয়েছি?”

তিনি আরো বলেন-

«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليك حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء، وقال: اللَّهُمَّ اشهد»

“নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্ভ্রম, তোমাদের এ দিন ও তোমাদের এ মাস ও তোমাদের এ শহরের মতই হারাম। (এদের এগুলোতে অন্যের হস্তক্ষেপ অবৈধ, সাবধান!) আমি কি একথা তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি ? তারা বলল- হ্যাঁ।” এরপর তিনি আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচু করে বললেন- হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।[২১]

৬. আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের নিজেদের মধ্য হতে একজন ইমাম নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার কাছে তারা নেতৃত্বের বাই‘আত গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে একসাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা হবে এক উম্মত। তাদের ইমাম ও আমীরদের প্রতি আল্লাহর অবাধ্য কোনো কিছু করতে নির্দেশ দান ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর অবাধ্য কোনো কিছুতে সৃষ্টির আনুগত্য করতে হবে না।

আর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, যদি কোনো মুসলিম তার নিজ দেশে ইসলামকে প্রকাশ্যভাবে পালন করে চলতে না পারেন, ইসলামের দিকে মানুষদের দাওয়াত দিতে না পারেন, তাহলে তাদেরকে আল্লাহ

---

[21] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার সংক্ষেপ বক্তৃতা, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর ভিতর থেকে যা পাওয়া গেছে আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাদীদ তাঁর গ্রন্থ ‘‘আল ইবাদত শরহি খুতাবি হুজ্জাতিল ওদা’তে একত্র করেছেন।

অন্য ইসলামী দেশে হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। **ইসলামী দেশ হচ্ছে এমন দেশ, যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং যেখানে একজন মুসলিম শাসক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেটা অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন।**

ইসলাম ভৌগলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ-দেশাত্মবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করে না। মুসলিমদের জাতীয়তা হচ্ছে ইসলাম। বান্দাহগণ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। যমীন হচ্ছে, আল্লাহর যমীন। মুসলিম সেখানে আল্লাহর শরী'আত মান্য করবেন এ শর্তে তিনি যে কোনো স্থানে চলাফেরার অধিকার রাখেন। এর কোনো একটির বিরোধিতা করলে আল্লাহর বিচার তার উপর কার্যকর হবে। আল্লাহর শরী'আত পালন ও তার হুদুদ (নির্ধারিত সাজা) প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও সম্পদ সংরক্ষিত হওয়ার গ্যারান্টি। প্রতিটি কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ থেকে ভিন্নমুখী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে সকল অমংগল।

আল্লাহ বিবেক সংরক্ষণ করেছেন: আল্লাহ তা'আলা বিবেকের কার্যক্ষমতা নষ্টকারী মাদকতা হারাম করে বিবেক বুদ্ধিকে সংরক্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক মাদক দ্রব্য পানকারীর জন্য প্রত্যেকবারের চল্লিশ থেকে আশি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছেন; তাকে এথেকে বিরত রাখা, তার বিবেক বুদ্ধিকে হেফাযত করা ও তার অনিষ্টতা থেকে মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের রক্ত হেফাযত করেছেন: কোনো হত্যাকারী কাউকে অবৈধভাবে তার উপরে চড়াও হয়ে হত্যা করলে তার উপরে কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) বিধান প্রদান করে মুসলিমের রক্তকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেমন অংগ প্রত্যংগের জন্য শরী'আত কিসাসের বিধান দিয়েছেন, তেমনি মুসলিমদেরকে জান, মাল ও মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করার বিধান শরী'আত প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ বলেন-

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ ﴾ [البقرة: ١٧٩]

"হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন নিহিত রয়েছে, যেন তামরা তাকওয়াহ অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারাহ-১৭৯)

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

«من قُتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد»

"যে ব্যক্তি নিজের নফছকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হল, সে শহীদ। যে তার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হল, সে শহীদ। যে তার নিজের সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হল সে শহীদ।"

আল্লাহ মুসলিমদের সম্ভ্রমকে হিফাযত করেছেন: তাই মুসলিমের অনুপস্থিতিতে হক ব্যতীত এমন কোনো কথা যা সে অপছন্দ করে তা শরী'আত হারাম করেছে। শরী'আতসম্মত প্রমাণাদি ব্যতীত সমকাম, যিনা প্রভৃতি চারিত্রিক অপরাধের মিথ্যা অপবাদকে শরী'আত নিষিদ্ধ করে মুসলিমদের মান সম্ভ্রমকে সংরক্ষণ করেছে।

আল্লাহ মুসলিমদের বংশ ও নসবকে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে হেফাযত করেছে। মানুষের মান-সম্মানকে চারিত্রিক অপরাধ দ্বারা দূষিত করা থেকে হেফাযত করার জন্য যিনাকে কঠিনভাবে হারাম করেছে এবং সেটাকে বড় কবীরা গুনাহ ঘোষণা করেছে। যিনাকারীর উপরে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে, যখন সে প্রবর্তিত শাস্তি কার্যকরী করার শর্ত পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলা সম্পদকে হেফাযত করেছে: আর তাই চুরি, ধোঁকা, লটারী, সুদ প্রভৃতি অবৈধ (হারাম) উপার্জনকে আল্লাহ হারাম করে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। শর্ত পূর্ণ হলে, চোর ও ডাকাতের হাত কাটার কঠোর শাস্তিকে ইসলাম শরী'আতভুক্ত করেছে। অথবা শর্ত পরিপূর্ণ না হলে চুরির প্রমাণ পাওয়া গেলে, ঐ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা তাকে একাজ থেকে বিরত রাখবে।

এ সমস্ত শাস্তির বিধান (হুদুদ) প্রণয়নকারী হচ্ছেন আল্লাহ। কোনো কাজ তার সৃষ্টকে সংশোধনের উপযোগী, তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। তিনি তাদের প্রতি অতীব দয়ালু। অপরাধী মুসলিমদের গোনাহ ক্ষমার জন্য এবং সমাজকে তাদের ও অন্যান্যদের অনিষ্টতা

থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি এ সমস্ত শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছেন। ইসলামের শত্রু ও তথাকথিত ইসলামের দাবীদারদের মধ্যে যারা হত্যাকারীকে হত্যা করা ও চোরের হাত কাটাকে দোষারূপ করে থাকে তাদের জানা উচিত যে তারা রোগীর এমন বিনষ্ট অঙ্গ কাটাকে দোষারূপ করছে যদি সে অঙ্গ কাটা না হয় তবে তার ক্ষতি গোটা সমাজকে আক্রান্ত করবে।[২২] অথচ ইসলামের শত্রু ও তাদের সেবাদাস তথাকথিত ইসলামে দাবীদাররা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অত্যাচার করে নির্দোষদের হত্যাকে ভাল মনে করে!!!

৭. বহির্বিশ্ব বিষয়ক রাজনীতি

অমুসলিমদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ দান করে আল্লাহর ঈমানের রোশনীতে আলোকিত করার জন্য ও পার্থিব জীবনের সম্পদের মধ্যে ডুবে থাকার অতৃপ্তি থেকে মুসলিম সত্যিকারের যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিকর নিয়ামত ভোগ করেছেন তা থেকে বঞ্চিতদেরকে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহ মুসলিমগণ ও তাদের নেতাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশনা এজন্যেই এসেছে যে এর মাধ্যমে সে এমন সৎ ও সঠিক মানুষরূপে গড়ে উঠবে; যার সততা ও কল্যাণ থেকে সকল মানব সন্তান লাভবান হবে এবং সে সকল মানুষদেরকে পরিত্রাণের চেষ্টা করবে; পক্ষান্তরে

---

22 .আক্রান্ত রোগীর ও তার পরিবারের অনুমোদন ক্রমে তার আক্রান্ত অংগ তার শরীরের নিরাপত্তার জন্যই কেটে ফেলা উত্তম।

মানুষের তৈরী জীবন-বিধানসমূহ এ থেকে ভিন্ন; কেননা এটি মানুষদের শুধু সৎ নাগরিক হওয়ার দাবী জানায়, অন্য কিছুর নয়। এটি এ পদ্ধতির অসারতা ও অপরিপূর্ণতা এবং ইসলামের উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি অর্জনের জন্য আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন; যাতে ইসলাম ও মুসলিমরা নিরাপত্তায় থাকে এবং আল্লাহ ও মুসলিমদের শত্রুরা ভীত থাকে। তেমনি ইসলামী শরী'আতের আলোকে প্রয়োজন হলে, অমুসলিমদের সাথে চুক্তিকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন। যতক্ষণ শত্রুরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ না করবে, অথবা যতক্ষণ তারা এমন কিছু না করবে, যা দ্বারা তারা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছে তা বোঝা যাবে; ততক্ষণ শত্রুদের সাথেও চুক্তি মুসলিমদের জন্য ভঙ্গ করা আল্লাহ হারাম করেছেন।

মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার প্রথমেই তাদেরকে প্রথমত: ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দানের জন্য, মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তা করতে অস্বীকার করে তবে তাদের থেকে জিযিয়া তথা প্রাণরক্ষা কর এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি অনুগত থাকার আহ্বান জানাতে হবে, যদি তাও অস্বীকার করে তাহলে ফিতনা অপসারিত হয়ে সমগ্র দীন তথা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হবে।

যুদ্ধের সময়ে সরাসরি যুদ্ধের কাজ করে বা পরামর্শ দিয়ে স্বপক্ষের যোদ্ধাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছে, এমন লোক ব্যতীত শিশু,

মহিলা, বৃদ্ধ ও উপসনালয়ের ধর্মযাজকদের হত্যা করাকে আল্লাহ মুসলিমদের উপরে হারাম করেছেন। আর মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কয়েদীদের সাথে ইহসানপূর্ণ তথা সর্বোত্তম ব্যবহার করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, কারো উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য ইসলাম যুদ্ধ করে না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যের প্রসার ও সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং মানুষদেরকে সৃষ্টের ইবাদত থেকে ফিরিয়ে স্রষ্টার ইবাদতমুখী করা।

৮. স্বাধীনতা:

ক. আকীদাহ বিশ্বাসের স্বাধীনতা: অমুসলিমগণ যারা ইসলামী হুকুমতের অধীনস্থ, তাদের কাছে ইসলাম বর্ণনা করা এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পরে আল্লাহ তা'আলা দীনে ইসলামে তাদের জন্য আকীদাহগত স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এতে তাদের জন্য সুখ-শান্তি ও মুক্তি রয়েছে। আর যদি তারা তাদের দ্বীনের উপরে অবস্থান করে, তাহলে তারা নিজেরাই কুফরী, দুর্ভোগ ও জাহান্নামের শাস্তিকে অনিবার্য করে নিল। এর মাধ্যমে তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো। আল্লাহর নিকট পেশ করার জন্য তাদের আর কোনো ওজর থাকবে না। কিন্তু দুনিয়াতে মুসলিমগণ তাদেরকে তাদের স্ব স্ব-আকীদাহ বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার স্বাধীনতা প্রদান করবেন, এ শর্তে যে, তারা নিজ হাতে মর্যাদাহীন অবস্থায় জিযিয়াহ তথা প্রাণরক্ষা কর প্রদান করবে এবং (তাদের ব্যাপারে) ইসলামের নির্দেশনার আনুগত্য করবে

আর মুসলিমদের সম্মুখে তাদের কুফরী ধর্মীয় আচরণ প্রকাশ করে বেড়াবে না।

অপরদিকে ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম হওয়ার পরে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, তা কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা হবে না। যদি সে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় (মুরতাদ হয়) তার প্রতিদান হচ্ছে হত্যা। কেননা তাওবাহ করা ও ইসলামের দিকে ফিরে আসা ব্যতীত তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। কারণ সে সত্যকে জানার পর তাথেকে বিমুখ হয়ে গেছে। আর যদি ইসলাম বিনষ্টকারী কারণসমূহের কোনো একটিতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে সে মুরতাদ হয়ে থাকে; তাহলে সে এটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তাওবা করবে, উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করবে এবং আল্লাহর কছে গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে।

ইসলাম বিনষ্টকারী ও বিধ্বংসী কাজের সংখ্যা অনেক: তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে-

১. আল্লাহর সাথে শির্ক করা: শির্ক হচ্ছে, বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া। যদিও সে উক্ত ইলাহকে আল্লাহর কাছে তার জন্য দো‘আ করা, তাকে আল্লাহর নিকটতম করার জন্য মাধ্যম হিসাবে হয়ে থাকুক না কেন। জাহেলী যুগের মুশরিকগণ যেমন সৎ ব্যক্তিদের সুপারিশ লাভের জন্য তাদের প্রতীকি চিত্র তৈরী করে, মূর্তিপূজা করতে তেমনি ইবাদত ও ইলাহের নাম ও অর্থ বুঝে সে অনুযায়ী এগুলোকে ইলাহ স্বীকার

করুক, অথবা উক্ত ইলাহ আল্লাহর সাথী ইলাহ, তার ইবাদত আল্লাহর ইবাদত তুল্য স্বীকার নাই করুক। যেমন ইসলামের দাবীদার মুশরিকগণকে যখন তাওহীদের দিকে আহ্বান করা হয়, তারা এ ভেবে এটি গ্রহণ করে না যে, নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিকে সিজদাহ করা বান্দার পক্ষ থেকে কোনো কিছুকে "এ আমার ইলাহ" বলা।

তাদের অবস্থা হচ্ছে তাদের মত, যারা মদকে অন্য নাম দিয়ে মদপান করে। তাদের অবস্থা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ٣﴾ [الزمر: ٢، ٣]

"দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে তাঁর ইবাদত কর। সাবধান! বিশুদ্ধ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারা বলে) যাতে তারা আমাদেরকে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কেবল সে জন্যই তাদের ইবাদাত করি। যে বিষয়ে তারা মত পার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যুক কাফিরকে হিদায়াত দান করেন না।" (যুমার-২-৩)

আল্লাহ আরও বলেন-

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ۝١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ۝١٤﴾ [فاطر: ١٣، ١٤]

"তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব। তাঁর জন্যই সকল সার্বভৌমত্ব। তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা খেজুরের আঁটির উপরের আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদি শুনেও তোমাদের জন্য সেটার উত্তর দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তাদেরকে যে আল্লাহর সাথে তোমরা শরীক করেছ, তারা তা অস্বীকার করবে এবং তোমাকে (এ বিষয়ে) সর্বজ্ঞাত আল্লাহর ন্যায় কেউ সংবাদ দিতে পারবে না।" (ফাতির- ১৩-১৪)

২. মুশরিক ও তাদের মত ইয়াহূদী, খৃষ্টান, আল্লাহদ্রোহী ও অগ্নিপূজক প্রভৃতি কাফিরদেরকে এবং তাগুত তথা যারা আল্লাহর অবতীর্ণকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিধান প্রদান করে না এবং আল্লাহর হুকুমের উপরে সন্তুষ্ট নয় এমন লোকদের কাফির না বলা (ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়)। তারা যে কাফের, এটা জানার পরে যে তাদেরকে কাফির বলবে না, সেও কাফির হয়ে গেল।

৩. বড় শির্ককে অনিবার্য করে এমন জাদুর কাজ। সুতরাং জাদুর কাজ করা এবং এ কাজের উপরে সন্তুষ্ট থাকাকে কুফরী কাজ

জেনেও যে এ কাজ করবে ও এর উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৪. ইসলামী শরী‘আত ও জীবন পদ্ধতির চেয়ে অন্য শরী‘আত ও জীবন পদ্ধতিকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা, অথবা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রদত্ত বিধি-বিধানের চেয়ে অন্যের বিধি-বিধানকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা। অথবা আল্লাহর কর্তৃক প্রদত্ত বিধান ছাড়া অন্যের বিধান দ্বারা হুকুম দেওয়া বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং তার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত জানার পরেও কোনো কিছুর উপর সন্তুষ্ট না থাকা ও বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করা।

৬. এমন কিছুকে নিয়ে ঠাট্রা বিদ্রূপ করা, যা সম্পর্কে সে জানে যে, এটি দীন ইসলামের অংশ।

৭. ইসলামের বিজয়ে অসন্তুষ্ট ও পরাজয়ে খুশী হওয়া।

৮. কাফিরদের বন্ধুরা কাফিরদের সাথে সংযুক্ত হবে; এটা জেনেও তাদেরকে ভালোবাসা ও সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

৯. যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শরী‘আত থেকে বের হয়ে যাওয়া যে সঠিক নয়,

এটা জানার পরেও তাঁর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়াকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা।

১০. আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। সুতরাং যদি কেউ এমনভাবে ইসলাম থেকে বিমুখ হয় যে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও সে ইসলামকে না জানে ও আমল না করে, সে কাফির হয়ে যাবে।

১১. ইজমা (উলামাদের একমত) অনুষ্ঠিত হয়েছে, এমন আহকাম (বিধানাবলী) হতে কোনো হুকুমকে জানার পরও তা অস্বীকার করা।

বস্তুত কুরআন ও সুন্নায় এ সব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের বহু দলীল প্রমাণাদি রয়েছে।

খ. মতামতের স্বাধীনতা: আল্লাহ তা'আলা দীনে ইসলামে মতামতের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে শর্ত হচ্ছে, যেন এ মতামত ইসলামী শিক্ষার বিরোধী না হয়। তাই কোনো তিরষ্কারকারীর তিরস্কারকে তোয়াক্কা না করে সকলের সম্মুখে সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাকে উত্তম জিহাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। মুসলিমদের শাসকগণকে উপদেশ দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি হচ্ছে, মতামতকে সম্মান প্রদর্শণের উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী মতামতকে প্রচারের

অনুমতি ইসলাম দেয় নি। কেননা, সেটা হচ্ছে, বিধ্বংসী ফিতনা ফ্যাসাদ ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ. ব্যক্তি স্বাধীনতা: পবিত্র ইসলামী শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলা দীনে ইসলামে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুমোদন দান করেছেন। প্রতিটি মানুষ, পুরুষ হোক বা মহিলা, তাদের মধ্যে ও অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম যেমন- বেচাকেনা, দান, ওয়াক্ফ, ক্ষমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পুরুষ মহিলাকে তাদের জোড়া বেছে নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ কাউকে পছন্দ না করে, এ ক্ষেত্রে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় নি। দীনের আকীদাহ-বিশ্বাসে যদি সমতা না থাকে তবে সেখানে এমন পুরুষ নির্বাচনের অনুমতি ইসলাম কোনো মহিলাকে দেয় নি। এটা উক্ত মহিলার আকীদা বিশ্বাস ও মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করার জন্যই।

মহিলার ওলী-অভিভাবক তথা তার বংশের সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধিই মহিলার বিয়ের দায়িত্ব নিবে; কারণ কেননা ব্যভিচারীনীর কাজের সাথে মিল থাকার কারণে মহিলা নিজে নিজে বিয়ে সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কন্যার অভিভাবক বরকে বলবেন "জনৈকা হচ্ছে তোমার স্ত্রী।" বর বলবে! "আমি গ্রহণ করলাম।"

ইসলাম কোনো মুসলিমকে আল্লাহর শরী'আতের সীমা লংঘনের অনুমতি দেয় নি। কারণ সে এবং তার মালিকানাধীন সবার মালিকই

তো আল্লাহ। সুতরাং তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড হতে হবে আল্লাহর শরী‘আতে সীমার গণ্ডির ভিতরেই, যে শরী‘আতকে তিনি তার বান্দাদের জন্য রহমত করে প্রণয়ন করেছেন। যে কেউ এ শরী‘আতের উপর চলবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে, তার সুখী সমৃদ্ধ জীবন লাভ হবে, পক্ষান্তরে যে এর বিরোধিতা করবে, সে দুঃখ লাভ করবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা যিনা, সমকামিতাকে শক্তভাবে হারাম করেছেন। অনুরূপভাবে আত্মহত্যা এবং আল্লাহ তার সৃষ্টিকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা পরিবর্তন করাকে মুসলিমের উপরে হারাম করা হয়েছে। অপরদিকে গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগল সাফ করা, খৎনা দেওয়া এগুলো করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর শত্রুদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব তথা চিহ্ন রয়েছে এ সবের অনুরূপ হওয়াকে আল্লাহ মুসলিমের জন্য হারাম করেছেন। কেননা বাহ্যিক দিক থেকে পূর্ণভাবে তাদের মত হওয়া ও তাদেরকে ভালবাসা, ধীরে ধীরে পূর্ণভাবে তাদের মত হতে ও প্রাণ দিয়ে তাদের ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহ মুসলিমকে চান, যেন তিনি সঠিক ইসলামী চিন্তার উৎস হয়। যেন তিনি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও তাদের মতামতের আমদানীকৃত স্থানে পরিণত না হয়। আল্লাহ চান, মুসলিম যেন উত্তম আদর্শবান হয়। অন্ধ অনুকরণকারী না হয়।

আর যদি অমুসলিমগণ যোগ্যতা, সঠিক কারিগরী ও কৌশলের অভিজ্ঞতার দিক থেকে মুসলিমদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে যায়, তাহলে

ইসলাম তাদের থেকে তা শিক্ষা করা ও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের শিক্ষক (তিনিই তাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন)।

আল্লাহ বলেন-

﴿ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥ ﴾ [العلق: ٥]

“আল্লাহ মানুষকে যা তারা জানে না তা শিক্ষা দিয়েছেন।” (সূরা আল-আলাক-৫)

মানুষ নিজের স্বাধীনতা হতে লাভবান হওয়া, তার মর্যাদা সংরক্ষণ করা ও মান সম্ভ্রমকে নিজের আত্মার অনিষ্টতা বা অন্যের অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর জন্য এটি হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম উপদেশ ও সংশোধনের উৎকৃষ্ট পন্থা।

ঘ. বাসস্থানের স্বাধীনতা: আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে বাসস্থান গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং কারো জন্য অন্য কারো বাড়িতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ নয় এবং বিনা অনুমতিতে তার বাসস্থানের দিকে দৃষ্টিপাতও বৈধ নয়।

ঙ. উপার্জনের স্বাধীনতা: শরী‘আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমকে উপার্জন ও ব্যয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ শ্রমদান ও উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তার নিজের ও তার পরিবারের ভরণ পোষণ সংকুলান হয় এবং তা কল্যাণের ও

ছাওয়াবের কাজে ব্যয় করতে পারে। একই সাথে সুদ, লটারী, ঘুষ, চুরি, ভবিষ্যৎ গণনা, জাদু, যিনা, সমকামিতা প্রভৃতির অবৈধ উপার্জনকে আল্লাহ হারাম করেছেন। এ সমস্ত উৎস থেকে যেমন উপার্জন হারাম তেমনি সেখানে ব্যয় করাও হারাম। সুতরাং শরী'আতসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত মুসলিম কোথাও ব্যয় করবে না। এটি হচ্ছে আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য উপদেশ, হিদায়াত ও সংশোধনের উচ্চতর স্থান, যাতে করে তিনি হালাল আয়ের মাধ্যমে বিত্তশালী হয়ে সুখ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন।

৯. পরিবার:

ইসলামী শরী'আতে আল্লাহ তা'আলা পরিবারের জন্য অত্যন্ত পরিপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, যারা তা গ্রহণ করবে তাদের জন্য সৌভাগ্যের যাবতীয় মাধ্যম বাস্তবায়িত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি উত্তম কথা, যদি তারা তার থেকে দূরে থাকে তবে তাদের সাথে অবিরত সাক্ষাত-যিয়ারত, তাদের প্রয়োজন পূরণ, তাদের জন্য খরচ করা, তাদের উভয়ে কিংবা একজন যদি দরিদ্র হয় তবে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মাধ্যমে ইহসান তথা সর্বোত্তম আচার-আচরণ করার বিষয়টি শরী'আতে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তির ধমকি দিয়েছেন যারা পিতামাতার প্রতি গুরুত্ব দেয় না, পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রতি ইহসান বা উত্তম ব্যবহার করে তাদের জন্য সৌভাগ্যশালী হওয়ার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা

বিবাহের নিয়ম পদ্ধতি দিয়ে শরী'আত প্রদান করেছেন এবং তার নিজের কিতাবে এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষায় একে শরী'আতের আওতাধীন করার বিজ্ঞানসম্মত কারণও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে,

১. চরিত্র পবিত্র রাখা এবং গুপ্তাঙ্গকে অবৈধ কাজ (যিনা) থেকে রক্ষা করা আর চোখকে হারাম দেখা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমসমূহের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম।

২. বিবাহ স্বামী স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের আরাম আয়েশ ও তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা করে। কেননা আল্লাহ তাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার্দ্রতা সৃষ্টি করেছেন।

৩. বিবাহের মাধ্যমে শরী'আত সম্মতভাবে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যা মুসলিমদেরকে চরিত্রবান ও যোগ্যতম করে।

৪. বিবাহে স্বভাবগত দিক থেকে আল্লাহ যাকে যা করার যোগ্যতা দান করেছেন সে অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সেবা করার সুযোগ দান করে।

সুতরাং পুরুষ ঘরের বাইরে কাজ করে, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করার সম্পদ উপার্জন করে। আর স্ত্রী বাড়ির মধ্যে কাজ করে, গর্ভধারণ করে, শিশুদের দুগ্ধ দান করে, প্রতিপালন করে, স্বামীর জন্য খাদ্য ও ঘর বিছানা তৈরী করে। যদি পুরুষ ক্লান্ত ও চিন্তাযুক্ত

অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে, তার ক্লান্তি ও চিন্তা দূর হয়। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সংস্পর্শ লাভ করে এবং সকলেই আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ হয়ে দিন কাটায়। পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে স্ত্রী যদি নিজের খরচ করা বা নিজ আয় দিয়ে স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য কিছু কাজ করে, তা নিষিদ্ধ নয়, তবে সেখানে কিছু শর্ত রয়েছে:

১. তার কাজ এমন হবে যেখানে পুরুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ নেই। যেমন তার ঘর, তার নিজের শষ্য ক্ষেত্র। নিজের স্বামীর, নিজের পরিবারের শস্য ক্ষেত্রে সে কাজ হতে হবে। অপর দিকে মিল-কারখানা, ব্যবসার স্থান,অফিস প্রভৃতি স্থানে পুরুষের সাথে মেলামেশা করে কাজ করা মহিলাদের জন্য জায়েয নয়। এ ধরনের কাজ করার জন্য কোনো নারীকে তার সন্তান, স্বামী, পিতামাতা ও নিকটতমদের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া ঠিক নয়। কেননা, এটি হচ্ছে তাকে ও সমাজকে ফাসাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার সমান। সুতরাং মহিলা যতক্ষণ নিজের বাড়িতে পবিত্রাবস্থায় সংরক্ষিতা হয়, ততক্ষণ কোনো পরুষের সংস্পর্শে সে আসে না, কোনো পাপিষ্ঠ হাত তার দিকে প্রসারিত হয় না, কোনো খেয়ানতকারীর চক্ষু তার দিকে তাকায় না। অপরদিকে যখন সে পুরুষের সামনে বের হয়, তখন সে হারিয়ে যায় এবং সে নেকড়ের মাঝে অবস্থিত ছাগলের অবস্থায় উপনীত হয়; যেন কিছুক্ষণ বিলম্ব না করেই তাকে টুকরা টুকরা করা হবে। এগুলো হচ্ছে, তার মান-মর্যাদার জন্য অতীব নিকৃষ্টতম অবস্থা।

যদি কোনো স্বামী এক স্ত্রীকে যথেষ্ট মনে না করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী অনুমোদন করেছেন, এ শর্ত সাপেক্ষে যে, বাসস্থান, খরচাদি, রাত্রি-যাপনের ক্ষেত্রে সে ইনসাফ করবে। তবে হৃদয়ে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ইনসাফকে শর্ত করা হয় নি। কেননা এটা ঐ বিষয়ে, যা মানুষের সামর্থ্যের উর্ধ্বে বলে আল্লাহ নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ﴾ [النساء: ١٢٩]

"তুমি গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও কখনো স্ত্রীদের ভিতরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না"। [সূরা আন-নিসা: ১২৯] আর তা হচ্ছে ভালোবাসা ও এ জাতীয় ব্যাপারে। বস্তুত এ ইনসাফ না করতে পারার জন্য আল্লাহ একাধিক বিয়ে করাকে নিষেধ করেন নি। কেননা, এটা সামর্থ্যের বাইরের বিষয়। আল্লাহ তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং যারা সাধ্য অনুযায়ী ইনসাফ করতে পারবেন তাদের জন্য একাধিক বিয়েকে অনুমোদন করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাদের জন্য কোনটি মঙ্গলের তা সবচেয়ে ভাল জানেন। এটা হচ্ছে পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই কল্যাণকর। কেননা, একজন সুস্থ পুরুষের যৌন শক্তির দিক থেকে যে সামর্থ্য থাকে, তা দিয়ে সে চারজন মহিলার যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করে তাদেরকে চারিত্রিক কলুষমুক্ত করতে পারে। যদি তার জন্য একজন স্ত্রীকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়; যেমন খৃষ্টান[২৩] ও অন্যান্যগণ করে

[23] .আল্লাহর নবী ঈসা (আ) একাধিক বিবাহ হারাম করেন নি। এটা করেছে খৃষ্টানরা নিজেদের ইচ্ছা

থাকে তাহলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। তথাকথিত ইসলামের দাবীদাররা যে এক বিয়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে তাতে যদি বিয়েকে সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে নিম্ন বর্ণিত অঘটন ঘটতে পারে:

প্রথমত: যদি উক্ত ব্যক্তি মুমিন ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হয়, আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সে নফছের হালাল প্রয়োজনকে সংকোচিত করে বঞ্চিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হবে। কেননা একজন মহিলার গর্ভধারণের শেষ সময়গুলোতে, নিফাস, হায়িয ও রোগের অবস্থায় যৌন কাজ সম্ভব হয় না। সুতরাং তার স্বামীকে জীবনের কিছু অংশ স্ত্রী ছাড়াই কাটাতে হয়। এটা ঐ সময়ে যখন উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আকর্ষনীয়া হয়ে থাকে, একে অপরকে ভালবাসে। পক্ষান্তরে যদি তার কাছে সে আকর্ষণীয়া না হয়, তাহলে বিষয়টি হয় আরো ঝুকিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত: যদি স্বামী আল্লাহর অবাধ্য হয়, খিয়ানতকারী হয়, সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে অশ্লীল যিনায় নিমগ্ন হবেই। অনেকেই যারা একাধিক বিয়েকে স্বীকার করে না ঠিকই, তারা অসংখ্য যিনা ও খিয়ানতের অপরাধে নিমজ্জিত হয়। এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক এ যে, সে শরী'আতসম্মত একাধিক বিবাহকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন জানার পরও সে এর বিরোধিতা করে কুফরীর গন্ডিতে প্রবেশ করবে।

আকঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য।

তৃতীয়ত: একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হলে, বহু মহিলা বিবাহ হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবে। এ অবস্থায় পবিত্রা চরিত্রবতী দরিদ্র অবস্থায় বঞ্চিত জাবনযাপন করবে। আর অসতী পাপিষ্ঠাদের সম্ভ্রম নিয়ে পাপীরা আনন্দের খেলা খেলতে থাকবে।

কারণ সবাই জানে যে, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপদজনক কাজ করতে গিয়ে পুরুষরা বেশি বেশি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সে জন্য মহিলার সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি। ঠিক তেমনি মহিলারা সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মাহর সংগ্রহ ও দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনের অপরাগতার জন্য অনেক পুরুষ তা পেরে উঠে না। এর দ্বারা জানা গেল যে, নিশ্চয় ইসলাম মহিলাদের প্রতি ইনসাফ করেছে এবং তার প্রতি দয়া দেখিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা একাধিক বিবাহের বিরোধিতা করে, তারা বস্তুত মহিলাদের, মানসম্ভ্রমের এবং নবী দের শত্রু। কারণ একাধিক বিবাহ নবীদের সুন্নাত। তারা মহিলাদের বিয়ে করতেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ যে শরী'আত দিয়েছেন সেটা অনুযায়ী স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহে একত্রিত করতেন।

অন্যদিকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রী যে হিংসা বা চিন্তা ভাবনায় পতিত হয়, বস্তুত এটি আবেগ জনিত কারণেই হযে থাকে। আর ইসলামে কোনো বিষয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়। বিয়ের পূর্বে মহিলাদের পক্ষ থেকে তার বর্তমানে কোনো স্ত্রী গ্রহণ না করার শর্তারোপ সম্ভব। স্বামী এটা গ্রহণ করলে সে শর্ত পূর্ণ করা

অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যদি স্বামী তার ঐ স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিয়ে করে তখন স্ত্রীর অধিকার থাকবে সে বিয়ে ভঙ্গ করার কিংবা প্রতিষ্ঠিত রাখার। আর তখন স্বামী মাহর হিসেবে তাকে যা দিয়েছে তার কোনো কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

আর আল্লাহ তা'আলা বিয়েকে শরী'আতসম্মত করেছেন। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য থাকা, সুখী না হওয়া ও একের প্রতি অপরের ভালবাসা না থাকার ক্ষেত্রে। এটা এ উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে যেন মতপার্থক্য অবস্থায় অসুখী জীবন কাটাতে না হয়। যাতে তারা একে অপরের মনের মত জায়গা বেছে নিতে পারে এবং দুনিয়ার[২৪] বাকী জীবন সৌভাগ্যের সাথে কাটাতে পারে, আর আখিরাতে সুখ ভোগ করতে পারে; যদি উভয়ে ইসলামের উপরে মৃত্যুবরণ করে।

১০. স্বাস্থ্য:

স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামী শরী'আত চিকিৎসার সকল মূল বিষয়ে আলোচনা করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ও রাসূল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসসমূহে মানসিক ও শারীরিক রোগসমূহের ও তার চিকিৎসার বর্ণনা এসেছে।

---

[24] মুসলিম স মহিলারা পুনরুত্থান ও হিসাবের পরে জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতবাসী যাকে তিনি চান স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হবে। কোনো মুসলিম স্ত্রীর কয়েকবার বিয়ে হয়ে মারা গেলে, যিনি দুনিয়ায় তার সবচেয়ে প্রিয় স্বামী ছিলেন তিনি জান্নাতবাসী হলে, তাঁকেই তাঁকে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾ [الاسراء: ٨٢]

“যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আমি কুরআনে তা নাযিল করছি।” (বনী ইসরাইল: ৮২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل»

“আল্লাহ ঔষধ না দিয়ে কোনো রোগ পাঠান নি। যাকে জানানো হয়েছে জেনেছে, যাকে এথেকে মূর্খ রাখা হয়েছে, মূর্খ রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন-

«تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام»

“হে আল্লাহর বান্দারা! চিকিৎসা কর, হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা কর না।” আল্লামাহ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রচিত “যাদুল মায়াদ ফি হাদিয়ী খাইরিল ইবাদ” গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে, তা দেখা যেতে পারে। কেননা, এটি ইসলামী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইসলামের বর্ণনা ও শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী বিষয়ক অত্যন্ত উপকারী অত্যন্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

১১. অর্থনীতি,ব্যবসা,কারিগরি ও কৃষি:

পানি, খাদ্য, মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং যে সমস্ত সংস্থা মানুষদের শহর ও গ্রামকে হেফাজত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে চলা-ফেরার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার, জালিয়াতি ও মিথ্যা প্রতিরোধ করা প্রভৃতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে; এদের সম্পর্কে ইসলামে পরিষ্কার ও পুরিপূর্ণভাবে বর্ণনা এসেছে।

১২. গোপন শত্রু ও তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কুরআনে কারীমে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন যে, তাদের বহু শত্রু রয়েছে। যদি সেসব শত্রুর নেতৃত্ব মেনে চল ও তাদের অনুসরণ কর তাহলে সেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তাই তিনি তাদের থেকে সাবধান করেছেন এং তাদের তেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তাও বর্ণনা করেছেন। এ সকল শত্রু হচ্ছে:

প্রথম শত্রু: অভিশপ্ত শয়তান

এ শয়তান অন্যান্য শত্রুদেরকে মানুষের বিরুদ্ধে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম ও মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামের এমন শত্রু যে তাদেরকে জান্নাত হতে বের করেছে। সে দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানদের জন্য চিরন্তন শত্রু। তারা যাতে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে, তার সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয় (আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি) সেই চেষ্টা সাধনাই সে করে। যাকে সে কুফরিতে নিমজ্জিত করতে অক্ষম

হয়, তাকে পাপে নিমজ্জিত করে; যাতে সে আল্লাহর গজব ও শাস্তি লাভ করে।

শয়তান এমন এক সত্তা যে মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরা ও উপশিরাতে চলাচল করে। তাদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। খারাপকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে, যাতে সে তার আনুগত্য করে খারাপের মধ্যে পতিত হয়। এ থেকে বাঁচার উপায়, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন, যখন মুসলিম রাগান্বিত হয়ে পড়বে এবং গুনাহে নিমজ্জিত হবে তখন বলবে-

'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম'। "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" তখন তার রাগ আর কাজ করবে না, সেও গুনাহের দিকে অগ্রসর হবে না। আর মুসলিম মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করবেন যে, পাপের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে প্রবণতা মনে ধারণ করছে তা শয়তানের দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে; যাতে তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করতে পারে। অতঃপর শয়তান তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦ ﴾ [فاطر: ٦]

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু এবং তাকে শত্রু বলেই মনে কর। সে তার দলকে আহ্বান জানায়, যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।" (সূরা ফাতির-৬)

দ্বিতীয় শত্রু: আত্মপূজা এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও অন্য কেউ সত্য নিয়ে আসলে তা গ্রহণ না করার মানসিকতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লংঘনের আকাঙ্খা জাগে। কেননা এগুলো সবই তার মন যা চায় তার উল্টো। আবেগকে সত্য ও ইনসাফের উপরে স্থান দেওয়া আত্মপূজার অন্তর্ভুক্ত। এ শত্রু থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে, বান্দাহ আল্লাহর নিকটে আত্মপূজা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং যা আত্মপূজা করতে বাধ্য করে তা গ্রহণ করবে না, আত্মার আনুগত্য করবে না বরং সত্য বলবে এবং তিক্ত হলেও তা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় শত্রু: খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এমন নফস

খারাপ কাজের নির্দেশের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মনের ও প্রাণের হারাম চাহিদা পূরণ। যেমন-যিনা, মদ্যপান, রমযানে ওযর ছাড়া সিয়াম ভঙ্গ প্রভৃতি। যেগুলোকে আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোর দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এ শত্রু থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, আল্লাহর নিকট নিজের নফসের ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। হারাম চাহিদা পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। তেমনি যা খেলে ও পান করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, সে সমস্ত খাদ্য অথবা পানীয় আকর্ষনীয় হলেও বর্জন করে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। মনে মনে এ কথা স্মরণ করতে হবে যে, হারাম প্রবৃত্তি দ্রুত

তিরোহিত হয়ে যায়, যার জন্য পরবর্তীতে লজ্জিত ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত পথ থাকবে না।

চতুর্থ শত্রু: মনুষ্য শয়তানগণ

এরা হচ্ছে, আদম সন্তানদের মধ্যে পাপীগণ; যাদের নিয়ে শয়তান খেলা করে। তারা নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে এবং তাদের সাথী-সঙ্গীদের জন্য এ কাজকে সুন্দর করে প্রদর্শন করে। এ শত্রু থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, তার থেকে সতর্ক থাকা, তার থেকে দূরে অবস্থান করা ও তার সংস্পর্শে না বসা।

১৩. মহৎ উদ্দেশ্য ও সুখকর জীবনঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর বান্দাহ মুসলিমদের যে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তা এ পার্থিব জীবন নয় আর না এ নশ্বর আকর্ষণীয় কোনো কিছু। বরং যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে তৈরী করছে তা হচ্ছে, শাশ্বত সত্য ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। আর তা হচ্ছে মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন। সুতরাং মুসলিম মাত্রই এ জীবনকে পারলৌকিক জীবনের ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করে। এ জীবনকে পারলৌকিক জীবনের শষ্য ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এ জীবনই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

একজন সত্যিকার মুসলিম সর্বদা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করে-

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জ্বিন ও মানুষদেরকে ইবাদাত করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে সৃষ্টি করিনি।” (সূরা আয-যারিয়াত:৫৬)

এবং স্মরণ করে আল্লাহর অন্য বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩ لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠ ﴾ [الحشر: ١٨، ٢٠]

“হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রতিটি নফসের চিন্তা করা উচিৎ; আগামীদিনের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যে কাজই কর, তা আল্লাহ নিশ্চয় সবিশেষ খবর রাখেন। যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে তিনি তাদেরকে নিজেদের ভুলিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এরা হচ্ছে ফাসিক। জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসী সমান নয়, জান্নাতবাসীগণ হচ্ছে সফলকাম।” (সূরা হাশর; ১৮-২০)

অনুরূপ স্মরণ করে আল্লাহর অপর বাণী-

﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]

“অতঃপর যে এক অনু পরিমাণ পূণ্য কাজ করে সে তা দেখবে এবং যে এক অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখবে।” (সূরা আয-যালযালাহ: ৭-৮)

সত্যিকারের মুসলিম আল্লাহর কালাম থেকে এ সকল আয়াত ও এর সমঅর্থের গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ স্মরণ করবেন, ফলে যে মহান উদ্দেশ্য ও যে কারণে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে ভবিষ্যত তাদের জন্য অবশ্য অবশ্যই অপেক্ষা করেছে, সে সম্পর্কে তারা উপদেশ লাভ করতে পারবেন। সুতরাং একক আল্লাহকে ইখলাসের সাথে ইবাদত করে এবং যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কাজের মাধ্যমে সত্যিকারের চিরস্থায়ী ঐ ভবিষ্যতের জন্য তার প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ। আল্লাহ তাহলে তার উপরে খুশী হবেন। তার আনুগত্যের কারণে এ দুনিয়াতে এবং মৃত্যুর পরে তার সম্মাণিত আবাসস্থলে প্রবেশ করিয়ে তিনি তাকে সম্মানিত করবেন। তাঁকে দুনিয়াতে সম্মানিত করা হবে, তাঁকে সুন্দর জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর বন্ধু হয়ে তারই তত্ত্বাবধানে বেঁচে থাকেন। তিনি আল্লাহর নূরেই দেখেন। যে সমস্ত ইবাদাতের নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আদায় করেন ও এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গোপন কথা বলার স্বাদ তিনি অনুভব করতে থাকেন। নিজের ক্বলব ও মুখ দিয়ে আল্লাহর যিকির বা তাকে স্মরণ করতে থাকেন। আর এর দ্বারা তার ক্বলবও আরাম বোধ করে।

আর সে তার কথা ও কাজ দ্বারা মানুষের প্রতি ইহসান করে, ফলে সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে তার সুনামের স্বীকৃতি শুনতে পান, তারা তার জন্য দো‘আ করেন, যা তাকে আনন্দ দেয় ও তার বুককে প্রসারিত করে। তিনি তার প্রতি হিংসুক, তিরষ্কারকারী, তার সুখ্যাতির অস্বীকারকারীকে দেখেও তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানো বন্ধ করে দেন না, কেননা তিনি তো এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছওয়াব কামনা করেন। দীনদার ও দীনের প্রতি যারা বিরূপ এমনি দুষ্ট মানুষদেরকে তিনি তার প্রতি কষ্ট দিতে ও ঠাট্টা করতে দেখেন; যা তাকে আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি যা করা হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং এটাই আল্লাহর রাস্তার কর্মীদের একমাত্র পাওনা জেনে ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার উপরে সে পথ সুদৃঢ় হয়ে যায়। তিনি নিজ হাতে অফিস অথবা কৃষিক্ষেত্রে অথবা ব্যবসাকেন্দ্রে অথবা কারখানায় কাজ করেন এ জন্য যে, ইসলাম ও মুসলিমগণ তার উৎপাদন থেকে লাভবান হবেন। যেদিন তিনি আল্লাহর সাথে ইখলাস সহকারে সৎ নিয়ত নিয়ে মিলিত হবেন, সেদিন তিনি এর জন্য পূণ্য লাভ করবেনই। তা ছাড়াও এ দ্বারা দুনিয়াতে উত্তম উপার্জন সংগ্রহ করে, তিনি নিজের নফস ও পরিবারের জন্য তা খরচ করেন, তা থেকে দানও করেন। ফলে তার আত্মা ধনবান, ভদ্র, অল্পতুষ্ট হয়ে আল্লাহর নিকটে ছাওয়াব কামনার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। কেননা আল্লাহ সামর্থ্যবান পেশাজীবি ঐ মুমিনকে পছন্দ করেন, যিনি খাবেন, পান করবেন, ঘুমাবেন তবে অপব্যয় করবেন না। যাতে এগুলোর মাধ্যমে

তিনি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য শক্তি অর্জন করতে পারেন, আর যাতে নিজ স্ত্রীকে ও নিজেকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে পবিত্র রাখার জন্য মেলামেশা করেন এবং যাতে এমন সন্তান-সন্ততি জন্ম দেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে ও তার জন্য জীবিত ও মৃত অবস্থায় দো'আ করবে। যা দ্বারা সৎ কাজ অবিরত হতে থাকবে। এ দ্বারা মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে। তিনি আল্লাহর কাছে সেজন্য ছাওয়াব লাভ করবেন। তিনি আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল নিয়ামতের সাহায্য নিয়ে এবং এসব নিয়ামত যে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে তার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার সকল নিয়ামতের শুকর আদায় করবেন ও এ কাজ দ্বারা ছাওয়াব লাব করবেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ কখনো কখনো ক্ষুধা, ভয়, রোগ, বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়। যাতে আল্লাহ দেখেন, (যদিও আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন[২৫]) উক্ত বান্দাহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপরে সন্তুষ্ট থেকে কতটুকু ধৈর্য ধারণ করতে পারেন। সুতরাং মুসলিম তাতে ছবর করবেন, সন্তুষ্ট থাকবেন এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীলদের জন্য যে ছাওয়াব অপেক্ষা করছে তা লাভের জন্য সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করবেন, তাহলে তার কাছে বিপদ খুব হালকা হয়ে যাবে। ফলে সে বিপদকে এমনভাবে গ্রহণ

---

[25] আল্লাহ বান্দাদেরকে নির্দেশ দেন ও নিষেধ করেন, তিনি পূর্ব হতেই জানেন যে, কে তার আনুগত্য করবে আর কে তার নাফরমানী করবে এ জন্য যে, যাতে বান্দাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া যায়। তাহলে পাপী বলতে পারবে না যে, আমার রবই আমার ঐ গুনাহের জন্য আমাকে সাজা দিয়েছে, যে গুনাহ আমি করি নি। আল্লাহ বলেন, "তোমার রব তার বান্দাদের উপরে মোটেই অত্যাচারী নন।"

করে নিবে যেমন রোগী ঔষধের তিক্ততাকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে মেনে নেয়।

যদি মুসলিম এ জীবনে যেমন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, এইরূপ উন্নত মানুষিকতা নিয়ে সত্যিকারে অবিনশ্বর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে, ঐ শাশ্বত কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারেন, দুনিয়ার কোনো কিছু যেটাকে ঘোলাটে করতে ব্যর্থ, মৃত্যুও যার প্রতিবন্ধক হয় না, তাহলে তার জন্য এ পার্থিব জীবনে ও মৃত্যুর পারলৌকিক জীবনে অনন্ত কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন-

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣ ﴾ [القصص: ٨٣]

"এটি পরকালের আবাসস্থল, এটি তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও ফাসাদ করে না। আর উত্তম পরিণাম তো রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা কাছাছ-৮৩)

মহান আল্লাহ কতই না সত্য বলেছেন-

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٩٧ ﴾ [النحل: ٩٧]

"নর হোক অথবা নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে কেউ ভাল কাজ করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই

তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদেরকে পুরষ্কৃত করব।" (সূরা নাহল-৯৭)

এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে এবং তার মত অন্যান্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ বলেন যে, নিশ্চয় পুরুষ সৎ কর্মকারী ও মহিলা সৎকর্মকারিনী যারাই এ জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আনুগত্য করবেন, আল্লাহ তাদেরকে তড়িৎ পুরষ্কার দিবেন। আর তা হচ্ছে ঐ সুখী সমৃদ্ধ পবিত্র জীবন, যে বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচন করেছি। তাছাড়াও বিলম্বে মৃত্যুর পরেও যে পুরষ্কার দিবেন, তা হচ্ছে শাশ্বত জান্নাতের নিয়ামত। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

«عجبًا للمؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له»

"আশ্চর্য, মুমিনের জন্য সব কাজই মঙ্গলময়। তাকে যদি আনন্দের কিছু স্পর্শ করে তাহলে সে শুকর আদায় করে, সেটি তার জন্য ভাল। আর যদি দুঃখজনক কিছু স্পর্শ করে এবং সে ধৈর্য ধরে তাও তার জন্য ভাল।"

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একমাত্র ইসলামের মধ্যেই সঠিক চিন্তা ভাবনা, ভাল-মন্দের সঠিক মাপকাঠি, ইনসাফ ভিত্তিক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। সুতরাং মনোবিজ্ঞান, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ ও অন্যান্য নিয়মনীতি এবং মানুষের তৈরী পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেকটি

মতামত ও চিন্তাচেতনা ইসলামের আলোকেই সংশোধন ও এ থেকেই সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। ইসলামের বিরোধিতা করে কৃতকার্য একেবারেই অসম্ভব বরং যারা ঐগুলোকে গ্রহণ করবে তাদের দুনিয়াও আখিরাতের জন্য ঐগুলোই হবে দুর্ভাগ্যের উৎসস্থল।

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় ভ্রান্তির নিরসন

১. ইসলামের নিন্দুকরা :

সবচেয়ে বেশি যারা ইসলামের প্রতি দোষারোপ করে থাকে তারা দু ধরনের মানুষ:

প্রথম শ্রেণি : এমন কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করে থাকে। তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম। তবে কথা ও কাজে ইসলামের বিরোধিতা করে। তারা এমন কাজ আঞ্জাম দেয়, ইসলামের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ইসলামের মুখপাত্র নয় এবং তাদের কাজকে ইসলামের কাজ বলা সঠিক নয়। এ শ্রেণির লোকরা হচ্ছে,

(ক) আকীদাহ বিশ্বাস হতে বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা। যেমন যারা কবরের পার্শ্বে তাওয়াফ করে। কবরবাষীর কাছে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা করে। কবরবাসী থেকে ভালমন্দ সংঘটিত হওয়া বিশ্বাস করে, ইত্যাদি।

(খ) চরিত্র ও ধর্মের দিক থেকে অধঃপতিত ব্যক্তিরা। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরদ্ব পরিত্যাগ করে থাকে। যিনা, মদ্যপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ কাজে নিমগ্ন হয়। আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালবাসে। তাদের অনুকরণ করে।

(গ) এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা ইসলামের নিন্দা করে অথচ তারা মুসলিম; তবে আল্লাহর উপর তাদের ঈমান দুর্বল। তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নও অসম্পূর্ণ। তারা কতিপয় ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করে তবে তারা তা পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে না। তারা কতিপয় হারাম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তবে তা বড় শির্ক অথবা বিভিন্ন প্রকার কুফরীর স্তরে পৌঁছায় না। তারা নিকৃষ্ট হারাম অভ্যাস লালন করে, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক তো নেই-ই বরং সেগুলোকে ইসলাম বড় গোনাহ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যেমন-মিথ্যা, ধোঁকা দেওয়া, প্রতিশ্রুতি ভংগ, হিংসা প্রভৃতি। এরা সকলেই ইসলামের অমংগল সাধন করে। কেননা অমুসলিম যারা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ তারা ধারণা করে, ইসলাম তাদেরকে এগুলোর অনুমতি দিয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণি: ইসলামের শত্রুদের মধ্যে ইসলামের উপরে যারা আক্রমানাত্মক তারাও ইসলামকে নিন্দা করে। তন্মধ্যে রয়েছে প্রাচ্যবিদ, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক এবং অনুরূপ লোকেরা, তারা ইসলামের শত্রু। ইসলাম পরিপূর্ণ ও ক্ষমাসুন্দর জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে দ্রুত প্রসারিত হওয়া তাদের মধ্যে গাত্রদাহ ছড়িয়ে দিয়েছে। কেননা ইসলাম স্বভাবগত দীন[২৬] হওয়ায় শুধুমাত্র সামনে

---

[26] শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "প্রতিটি নবজাতকই প্রকৃতি (ইসলাম) এর উপরে জন্ম নেয়। তাদের পিতামাতা তাদেরকে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" এ বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চয় প্রতিটি মানুষ ইসলামী প্রকৃতির উপরেই জন্ম নেয় এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে এর পরেই সে বিশ্বাস স্থাপন করে। যদি তাকে

উপস্থাপনের সাথে সাথেই স্বভাবগত হওয়ার কারণে মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়। প্রতিটি অমুসলিমই অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে এবং যে দ্বীন বা মতবাদকে সে গ্রহণ করে আছে তার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েই দিন কাটাচ্ছে। কেননা আল্লাহ যে প্রাকৃতিক স্বভাব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন এটি তার পরিপন্থী। তবে সত্যিকারের মুসলিম এথেকে ভিন্ন। কেননা তিনিই একমাত্র তার দ্বীনকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছেন। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম সত্য ধর্ম, যা আল্লাহই প্রণয়ন-প্রবর্তন করেছেন। আর আল্লাহ প্রণীত বিধানই মানুষকে আল্লাহ যে স্বভাবের উপরে সৃষ্টি করেছেন তার সংগে সংগতিপূর্ণ।

এজন্য আমরা প্রতিটি খৃষ্টান, প্রতিটি ইয়াহূদী এবং অন্যান্য যারাই ইসলামের বাইরে রয়েছে তাদেরকে বলব, তোমার সন্তান-সন্ততি ইসলামের স্বভাবজাত দীনের উপরই জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু তুমি এবং তাদের মা তাদেরকে খারাপ লালন-পালনের মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছ, তাদেরকে কুফরির দিকে নিয়ে গেছ, সে কুফরি হচ্ছে ইসলাম ব্যতীত অন্য যত মত ও পথ।

প্রাচ্যবিদ ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে হিংসুকরা ইচ্ছা করেই ইসলাম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জঘন্য মিথ্যাচার করে থাকে।

বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয় তাহলে সে পিছপা না হয়ে ইসলামকে গ্রহণ করবে। অপরদিকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম ও বাতিল মতাদর্শকে যারা গ্রহণ করেছে, বস্তুত এটা প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণেই হয়েছে।

● কখনো তারা তাঁর রিসালাতকে মিথ্যা বলে

● আবার কখনো তাঁর প্রতি দোষত্রুটি ও অপবাদ দিয়ে অহেতুক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। অথচ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত একজন পরিপূর্ণ মানুষ, সকল দোষ ও অপূর্ণতা মুক্ত।

● এছাড়াও সবজান্তা ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত হওয়ার পরেও ইসলামের ইসাফপূর্ণ কিছু আহকামকে তারা বিকৃত করেছে, যাতে এথেকে লোক ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন। কেননা তারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর সত্য সর্বোচ্চ, কোনো কিছুই তাথেকে উঁচু হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন-

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٩ ﴾ [الصف: ٨، ٩]

“তারা চায় নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে ফেলতে। আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই; কাফিররা যতই অপছন্দ করুক না কেন। তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি সকল দ্বীনের উপরে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন। মুশরিকগণ (এটাকে) যতই অপছন্দ করুক না কেন।” (ছফ: ৮-৯)

২. ইসলামের উৎসমসূহ

হে জ্ঞানবান মানুষ, যদি আপনি সত্যিকারের ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ্ বুখারী, ছহীহ্ মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, সুনানি আবি দাউদ, সুনানি নাসায়ী, সুনানি তিরমিযী, সুনানি ইবনে মাজাহ, সুনানি দারমী গ্রন্থে লিখিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্ভুল হাদীসসমূহ পাঠ করুন। ইবনি হিশাম প্রণীত আসসীরাত আন নববীয়াহ, ইসমাঈল ইবন কাসীর প্রণীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসীর, আল্লামাহ ইবনুল কাইয়িম প্রণীত 'যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল 'ইবাদ" ও এগুলোর মতই ইসলামের ঈমান, তাওহীদ পূর্ণ তীক্ষ্ণ বিবেক বুদ্ধি সহকারে আল্লাহর দিকে মানুষদের আহ্বানকারী গ্রন্থসমূহও পাঠ করুন|

শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন তায়মীয়াহ্, আল-ইমাম আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহহাব-দ্বাদশ হিজরী হতে এ পর্যন্ত শির্ক প্রসার লাভের পর আরব দ্বীপে ও অন্যান্য কিছু জায়গায় তার ও তাওহীদ পন্থীদের আমীর মুহাম্মাদ ইবন স'উদের বদৌলতে আল্লাহ দ্বীন ইসলাম ও তাওহীদের আকীদাহকে শক্তিশালী করেছেন।

অপরদিকে প্রাচ্যবিদ ও ঐ সমস্ত সম্প্রদায়, যারা ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত, তারা ইসলামের পরিপন্থী, তাদের পুস্তকাদি ইসলাম বিরোধী বিষয়ের দিকেই আহ্বান করে। যার অধিকাংশই পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তাদের পুস্তকাদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এর সাহাবীগণের সকলকে অথবা কিছু সংখ্যককে গালিগালাজ করে। অথবা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বানকারী ইমামগণ যেমন- ইবনি তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব প্রমুখদের সমালোচনা করে। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উঠায়। বস্তুত এ গ্রন্থগুলো পথভ্রষ্টকারী। সাবধান, এগুলোর ধোঁকায় পড়বেন না। এগুলো পাঠ করবেন না।

৩. ইসলামী মাযহাবসমূহ

প্রত্যেক মুসলিমই এক মাযহাবের উপরে রয়েছে। তা হচ্ছে, ইসলাম। যাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে, কুরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস। অপরদিকে যাকে ইসলামী মাযহাব বলা হয়, যেমন চার মাযহাব হাম্বলী, মালিকী, শাফেয়ী, হানাফী। বস্তুত এগুলো দ্বারা এ সকল ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের স্কুলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে ঐ সকল বিদ্যানগণ তাদের ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। তাদের প্রত্যেকের ছাত্রগণ কুরআন হাদীস থেকে চয়ন করে যে নিয়মনীতি ও মাসয়ালা লিখেছেন, সেগুলোকে উক্ত আলেমদের নামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে এগুলোই তাদের মাযহাবের নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এগুলো ও ইসলামের মূল কাজসমূহ একই। এগুলোর প্রত্যেকটির উৎস হচ্ছে, কুরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসসমূহ। আমরা তাদের মধ্যে যে সমস্ত মত পার্থক্য দেখি, তা শাখা-প্রশাখার ভিতরে, যা একেবারেই নগণ্য। এ সকল আলেমগণই

তাদের ছাত্রদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যা কুরআন ও হাদীছ সমর্থিত তা যদি অন্যের কথাও হয়, তা গ্রহণ করবে।

মুসলিম এর যে কোনো একটি গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। সে কুরআন ও হাদীসের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য। অপর দিকে অনেকেই এ সমস্ত মাযহাবের দিকে সম্বন্ধিত হয়েও আকীদাহ বিমুখ হয়, যেমন তারা কবরে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে সাহায্য চায়, আল্লাহর গুণ বা বিশেষণসমূহকে সঠিক ও প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে, এর অপব্যাখ্যা দেয়। বাস্তবে তারা তারা তাদের ঐ সকল মাযহাবের ইমামদের আকীদাহ বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজই করে। কেননা, এ সকল ইমামদের আকীদাহ হচ্ছে, সালাফে ছালিহীনের আকীদাহ, যার বর্ণনা 'মুক্তপ্রাপ্ত দল' এর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে।

৪. ইসলাম বহির্ভূত দলসমূহ:

ইসলামী বিশ্বে ইসলাম বহির্ভূত অনেক দলই পাওয়া যায়, যারা ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত। যারা তাদের নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে, তবে তারা সত্যিকারের মুসলিম নয়। কেননা তাদের আকীদাহ বিশ্বাসের রয়েছে আল্লাহর সাথে কুফরি, তার নিদর্শনাবলী ও তার একত্ববাদ অস্বীকার করা। এ সমস্ত দলের মধ্যে একদল হচ্ছে,

‘বাতিনীয়াহ’ সম্প্রদায়; তাদের মত, সবকিছু ও সর্বস্থানে আল্লাহর অনুপ্রবেশ ঘটা, তারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাস করে থাকে যে দ্বীনের প্রতিটি মূল বচন অর্থাৎ “আয়াত ও হাদীসের” অপ্রকাশ্য একটি অর্থ রয়েছে যা প্রকাশ্য যে অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন ও যার উপরে মুসলমানদের ঐক্য (ইজমা) সংগঠিত হয়েছে তাথেকে ভিন্ন। তারা তাদের ইচ্ছেমত এ সমস্ত অপ্রকাশ্য অর্থ তৈরী করেছে।[২৭]

এ ‘বাতিনীয়াহ’ সম্প্রদায়ের জন্মের উৎস হচ্ছে, ইয়াহূদী, অগ্নি উপাসক, আল্লাহদ্রোহী দার্শনিকগণ যখন পারস্য দেশে ইসলামের প্রসারে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা একত্রিত হয়ে এমন একটি মতাদর্শ আবিষ্কার করার জন্য পারস্পরিক পরামর্শ করল; যার উদ্দেশ্য হচ্ছে; মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করা এবং মহাগ্রন্থ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে চিন্তায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। যাতে মুসলিমগণ বিভিন্ন দলে পৃথক হয়। এজন্য তারা এ বিধ্বংসী মতাদর্শের উদ্ভাবন করে এবং এর দিকে অন্যদেরকে আহ্বান জানায়। তারা নিজেদেরকে আ’লি

---

[27] এ বাতিনীয়াহ সম্প্রদায়ের অনেক উপাধি রয়েছে, তারাও অনেক দলে বিভক্ত। ভারত, সিরিয়া, ইরান, ইরাক ও অন্যান্য দেশে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ববর্তী উলামাদের মধ্যে অনেকেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে শাহরাস্তানী তার বই ‘‘আল-মিলাল ওয়ান নিহাল’’ এ যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। যেমন- শেষ যুগীয় উলামাদের কেউ কেউ তাদের মধ্যে নতুন দলকেও উল্লেখ করেছেন। যেমন-কাদিয়ানীয়াহ, বাহায়ীয়াহ। তাদের মধ্যে হতে মুহাম্মাদ সায়ীদ কিলানী ‘‘যাইলুল মিলাল ওয়ান নিহাল’’ মদীনা মুনাওয়ারাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাইখ আব্দুল কাদির, শাইবাতুল হামদ ‘‘কিতাব আল-আদইয়ান ওয়াল ফিরাক অল মাযাহির আর মু‘আছিরাহ’’ গ্রন্থে ঐ সমস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখেছেন।

বাইত তথা নবী-পরিবারের দিকে (অসত্যভাবে) সম্পর্কযুক্ত করে, যাতে করে সাধারণ জনগণকে ভালভাবে ধোঁকায় ফেলতে পারে; এভাবে তারা অনেক মূর্খ মানুষদেরকে শিকার করেছে ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে।

ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'কাদিয়ানীয়াহ' অন্যতম। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাম অনুযায়ী এরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সে নবী হওয়ার দাবী করে। ভারতে ও তার আশেপাশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। ইংরেজগণ ভারতে তাদের উপনিবেশ শাসনের সময় এ গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। তাকে ও তার অনুসারীদেরকে প্রচুর সুযোগ দিত, যাতে করে অনেক মূর্খরাও তার অনুসারী হয়। কাদিয়ানীরা ইসলামকে মুখে প্রকাশ করলেও আসলে তারা ইসলামকে ধ্বংস করা, অন্যদেরকেও এর গণ্ডি হতে যথাসম্ভব বের করে নিতে চেষ্টা করে। প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সে তাসদীকে বারাহীনে আহমদীয়াহ নামক যে বই লিখেছে সেখানে সে নবুওয়তের দাবী করেছে, ইসলামের মূল-বচন (নুছুছ)সমূহ তথা কুরআন ও সুন্নাহর শব্দকে রদবদল করেছে। তার বিকৃতির কিছু নমূনা যেমন, তার দাবী, ইসলামে জিহাদকে রহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ওয়াজিব তারা যেন ইংরেজের সাথে সন্ধি স্থাপন করে। ঐ সময় সে অন্য একটি বইও লেখে, যার নাম "তিরিয়াকুল কুলূব"। এ মিথ্যুক বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ১৯০৮ সালে মারা যায়। তার এ দাওয়াত ও এ পথভ্রষ্ট

সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব একজন পথভ্রষ্ট লোক ‘আল হাকীম নুরুদ্দীন’ এর কাছে ছেড়ে যায়।

ইসলাম বহির্ভূত এমনি বাতিয়ানীয়াহ সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায় হচ্ছে, **বাহায়ীয়াহ সম্প্রদায়।** আলী মুহাম্মাদ নামে এক ব্যক্তি **১৯শ** খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইরানে এটাকে প্রতিষ্ঠা করে। কারো কারো মতে, তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ আলী সিরাজী। সে ছিল শিয়াদের ‘ইছনা আশারীয়াহ’ (বারো ইমামী) সম্প্রদায়ের (বর্তমান ক্ষমতাসীন ইরান সরকারের দলের) লোক। এর পরে সে উক্ত সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে প্রসিদ্ধ বাহায়ীয়াহ মতাদর্শ আবিষ্কার করে এবং নিজেকে প্রতীক্ষিত মাহদী বলে প্রথমে ও পরে তার মধ্য আল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছেন বলে দাবী করে, এভাবে সে মানুষের ইলাহ হয়ে বসে। (বস্তুত কাফির ও আল্লাহদ্রোহীগণ আল্লাহ সম্পর্কে যা বলে তিনি তাথেকে বহু ঊর্ধ্বে।) সে পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব, জান্নাত, জাহান্নামকে অস্বীকার করে। সে কাফির ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের পথে চলতে থাকে। সে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে তাদেরকে এক করে ফেলে। সে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতকে ও ইসলামের বহু হুকুম আহকামকে অস্বীকার করে। তার ধ্বংসের পরে তার মন্ত্রী যে, ‘বাহা’ নামে খ্যাত হয়, সে তার দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটায় এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তার দিকেই সম্বন্ধ করে এ সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাহায়ীয়াহ’।

মুসলিম হওয়ার দাবী করা, ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, হজ্জ করা সত্ত্বেও **শিয়াদের বিরাট অংশ ইসলাম বহির্ভূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।** তারা দাবী করে যে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রিসালাতকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করে খিয়ানত করেছেন, বাস্তবে এটা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটেই পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলীকেই আল্লাহ বলে থাকে। তারা আলী ও তার সন্তান-সন্ততি, নাতি-পুতি, তার স্ত্রী ফাতেমা ও ফাতেমার মা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্মানে প্রচণ্ড রকমের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে থাকে। বরং তারা এদেরকেও আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তারা এদেরকে আহ্বান করে, তাদের কাছে দো‘আ করে। আরও বিশ্বাস করে থাকে যে এরা নিরপরাধ, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে রাসূল আলাইহিমুস সালামগণের মর্যাদার চেয়েও অনেক বড় (নাউযুবিল্লাহ)।

তারা বলে, মুসলিমদের হাতে বর্তমানে অবস্থিত কুরআনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ কুরআন তৈরী করে নিয়েছে। তাতে নিজের পক্ষ হতে আয়াত ও সূরা সন্নিবেশ করেছে। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে সবচেয়ে উত্তম মুসলিম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেয়। তাছাড়া উম্মুল মো'মেনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও গালি দেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার সন্তান-সন্ততিদের কাছে সুসময় ও দুঃসময় উদ্ধার কামনা করে প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ ছাড়া তাদের কাছেও দো‘আ করে।

অথচ আহলি বাইতের দল তথা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সন্তান সন্ততি তাদের সাথে সম্পর্কহীন। কেননা শিয়ারা তাদেরকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর উপরে মিথ্যা চাপিয়েছে। তাঁর বাণী রদবদল করেছে। তার যা বলে, তা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে।

এ সম্প্রদায়গুলো, যাদের বর্ণনা আমরা করেছি, এরা ইসলামের দাবীদার অথচ ইসলাম ধ্বংসকারী কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রতিটি জায়গার হে জ্ঞানী, হে মুসলিম, আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ এ মর্মে যে, ইসলাম শুধু দাবী করলেই হয় না। বরং কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীসমূহকে জানা ও সে অনুযায়ী আমলকে ইসলাম বলে। অতঃপর মহাগ্রন্থ কুরআন ও ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস নিয়ে গবেষণা করুন; হিদায়াত, নূর ও সোজা রাস্তা পাবেন, যা আপনাকে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর নিকটে নিয়ামতের জান্নাতে নিয়ে সৌভাগ্য লাভের পথে পৌঁছে দিবে।

মুক্তির দিকে আহ্বান

হে জ্ঞানবান, চাই পুরুষ হও বা মহিলা, যে এখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করনি তোমার কাছে মুক্তি ও সুখ সমৃদ্ধির এ আহ্বান পৌঁছাচ্ছি এ বলে যে,

- মৃত্যুর পরে কবরে ও পরে জাহান্নামের আগুনে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাও।
- আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করে নিজেকে রক্ষা কর। সত্যের সাথে বল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। পাঁচবার ছালাত আদায় কর। তোমার সম্পদের যাকাত দাও। রামাদান মাসের ছিয়াম পালন কর। আল্লাহর ঘর মক্কার হারাম শরীফের হজ্জ করা, যদি তার রাস্তা অতিক্রমে সামর্থ হও।
- আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমরা ইসলামের ঘোষণা দাও। কেননা এছাড়া কোনো শান্তি বা মুক্তি নাই।
- মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের আর কোনো ইলাহ নেই তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এ ইসলাম হচ্ছে ঐ সত্য দ্বীন, যা ব্যতীত আল্লাহ কারো পক্ষ থেকে কোনো দ্বীনকে গ্রহণ করবেন না। আমি আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল সৃষ্টিকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ

নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ইসলাম সত্য দ্বীন এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার করুণা ও অনুকম্পার মাধ্যমে আমি, আমার সন্তান সন্ততি ও মুসলিম ভাইয়েরা যাতে সত্যিকার মুসলিম হন, এ দো'আই করছি। তিনি যেমন আমাদের উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে জান্নাতে আমাদের সত্যবাদী আমানতদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্য সকল নবী আলাইহিমুস সালামের পরিবার পরিজন, সাথী-সংগীদের সাথে একত্রিত করেন; তা-ই কামনা করছি। আল্লাহর কাছে আরো চাচ্ছি যে, যারা এ পুস্তক পাঠ করবেন ও শুনবেন তাদেরকে এথেকে লাভবান করুন। হুঁশিয়ার! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষ্য থাকুন।

আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সংগীদের উপর। আর সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

সমাপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়